



www.banglainternet.com

represents

ISWAR CHANDRA

Bodhoday

বোধোদয়

বিজ্ঞাপন

[১৯৮৯ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত পঞ্চাধিকশততম সংস্করণ হইতে]

বোধোদয় নানা ইংরেজি পুস্তক হইতে সংকলিত হইল; পুস্তকবিশেষের অনুবাদ নহে। যে কয়টি বিষয় লিখিত হইল, বোধ করি তৎপাঠে, অমূলক কল্পিত গল্পের অপেক্ষা, অধিকতর উপকার দর্শিবার সম্ভাবনা। অল্পবয়স্ক, সুকুমারমতি বালক-বালিকারা অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন, এই আশায় অতি সরলভাষায় লিখিবার নিমিত্ত সবিশেষ যত্ন করিয়াছি; কিন্তু কত দূর কৃতকার্য হইয়াছি, বলিতে পারি না। মধ্যে মধ্যে অগত্যা যে যে অপ্রচলিত দ্রুহ শব্দের প্রয়োগ করিতে হইয়াছে, পাঠকবর্গের বোধসৌকর্য্যার্থে, পুস্তকের শেষে, সেই সকল শব্দের অর্থ লিখিত হইল। এক্ষণে, বোধোদয় সর্বত্র পরিগৃহীত হইলে, শ্রম সফল বোধ করিব।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্মা।

কলিকাতা।

২০শে চৈত্র। সংবৎ ১৯০৭।

একোনাশীতিতম সংস্করণের বিজ্ঞাপন

ত্রিপুরা জিলার অন্তঃপাতী বুন্দা গ্রামে যে ব্রীডিং ক্লাব অর্থাৎ পাঠগোষ্ঠী আছে, উহার কার্য্যদর্শী শ্রীযুত মহম্মদ রেয়াজ উদ্দীন আহম্মদ মহাশয়, বোধোদয়ের কতিপয় স্থল অসংলগ্ন দেখিয়া, পত্র দ্বারা আমায় জানাইয়াছিলেন। তৎপরে, কলিকাতাবাসী শ্রীযুত বাবু চন্দ্রমোহন ঘোষ ডাক্তার মহাশয়ও দুই তিনটি অসংলগ্ন স্থল দেখাইয়া দেন। ইহাতে আমি সান্তিশয় উপকৃত ও সবিশেষ অনুগৃহীত হইয়াছিলাম। তাঁহাদের প্রদর্শিত স্থল সকল স্থল পূর্ববৎ অসংলগ্নই থাকিত। এতদ্ব্যতিরিক্ত, আবশ্যক বোধে, কোনও কোনও স্থল কিয়ৎ অংশে পরিবর্তিত, কোনও কোনও স্থল কিয়ৎ পরিমাণে পরিবর্তিত হইয়াছে।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্মা।

কলিকাতা।

২২শে পৌষ। সংবৎ ১৯৩৯।

ষন্যবতিতম সংস্করণের বিজ্ঞাপন

এই পুস্তকের তাম্রপ্রকরণে নির্দিষ্ট ছিল, “তিন ভাগ দস্তা ও এক ভাগ তামা মিশ্রিত করিলে, পিতল হয়।” শ্রীমন্তসওদাগরপত্রিকার সম্পাদক মহাশয়েরা, বর্তমান সালের ২৫শে জ্যৈষ্ঠের পত্রিকাতে প্রদর্শিত করিয়াছেন, উপরি নির্দিষ্ট স্থলে, “এক ভাগ তামা” এই নির্দেশটি ভুল। “এক ভাগ তামা” ইহার পরিবর্তে, “চারিভাগ তামা” এরূপ নির্দেশ হওয়া উচিত। তদনুসারে, ঐ স্থল সংশোধিত হইয়াছে। এতদ্বিন্ন, রক্তপ্রকরণে, “তামা মিশ্রিত করিলে, উত্তম কাঁসা প্রস্তুত হয়,” এতদ্ব্যতী নির্দিষ্ট ছিল, তামা ও রাঙের অংশ নির্দিষ্ট ছিল না। উক্ত সম্পাদক মহাশয়েরা, এই নূন্যতারও উল্লেখ করিয়াছিলেন। তদনুসারে, এই নূন্যতারও পরিহার করা গিয়াছে সম্পাদক মহাশয়ের, এই ভুল ও এই নূন্যতার প্রদর্শন করিতে, আমি অতিশয় উপকৃত ও অনুগৃহী হইয়াছি, ইহা বলা বাহুল্য মাত্র।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্মা

কলিকাতা।

২৫শে ভাদ্র ১২৩৯ সাল।

পদার্থ

আমরা ইতস্ততঃ যে সকল বস্তু দেখিতে পাই, সে সমুদয়কে পদার্থ বলে। পদার্থ ত্রিবিধ, চেতন, অচেতন; উদ্ভিদ। যে সকল বস্তুর জীবন আছে এবং ইচ্ছামত গমনাগমন করিতে পারে, উহারা চেতন পদার্থ; যেমন মনুষ্য, পশু, পক্ষি, কীট ইত্যাদি। যে সকল বস্তুর জীবন নাই, যেখানে রাখ, সেইখানে থাকে, এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতে পারে না, উহাদিগকে অচেতন পদার্থ কহে; যেমন ধাতু, প্রস্তর, মৃত্তিকা ইত্যাদি। যে সকল বস্তুভূমিতে জন্মে, উহারা উদ্ভিদ পদার্থ; যেমন, লতা, তৃণ, ইত্যাদি।

ঈশ্বর

ঈশ্বর কি চেতন, কি অচেতন, কি উদ্ভিদ, সমস্ত পদার্থের সৃষ্টি করিয়াছেন। এ নিমিত্ত, ঈশ্বরকে সৃষ্টিকর্তা বলে। ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ। তাহাকে কেহ দেখিতে পায় না; কিন্তু তিনি সর্বদা সর্বত্র বিদ্যমান আছেন। আমরা যাহা করি, তিনি তাহা দেখিতে পান; আমরা যাহা মনে ভাবি, তিনি তাহা জানিতে পারেন। ঈশ্বর পরম দয়ালু; তিনি সমস্ত জীবনের আর্হরদাতা ও রক্ষাকর্তা।

চেতন পদার্থ

সমুদয় চেতন পদার্থের সাধারণ নাম জন্তু। জন্তুগণ, মুখ দ্বারা আহারের গ্রহণ, এবং মুখ ও নাসিকা দ্বারা বায়ুর আকর্ষণ করিয়া প্রাণধারণ করে। আহার দ্বারা শরীরের পুষ্টি হয়, তাহাতেই উহারা বাঁচিয়া থাকে। আহার না পাইলে, শরীর শূন্য হইতে থাকে এবং অল্প দিনের মধ্যেই প্রাণত্যাগ ঘটে।

প্রায় সকল জন্তুর পাঁচ ইন্দ্রিয় আছে। সেই পাঁচ ইন্দ্রিয় দ্বারা, তাহারা দর্শন, শ্রবণ, স্প্রাণ, আশ্বাদন ও স্পর্শ করিতে পারে।

পুস্তলিকার চক্ষু আছে, দেখিতে পায় না; মুখ আছে, খাইতে পারে না; নাসিকা আছে, গন্ধ পায় না; হস্ত আছে, কোনও কর্ম করিতে পারে না। কর্ণ আছে, কিছু শুনিতে পায় না। চরণ আছে, চলিতে পারে না। ইহার কারণ এই, পুস্তলিকা অচেতন পদার্থ, উহার চেতনা নাই। ঈশ্বর কেবল জন্তুদিগকে চেতনা দিয়াছেন। তিনি ভিন্ন আর কোনও বস্তুর চেতনা দিবার ক্ষমতা নাই। দেখ, মনুষ্যেরা পুস্তলিকার মুখ, চোখ, নাক, কান, হাত, পা সমুদয় গড়িতে পারে, এবং উহাকে ইচ্ছামত বেশ ভূষাও পরাইতে পারে, কিন্তু চেতনা দিতে পারে না। উহা অচেতন পদার্থই থাকে; দেখিতেও পায় না, শুনিতে পায় না, চলিতেও পারে না বলিতেও পারে না।

পৃথিবীর সকল স্থানেই নানাবিধ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ জন্তু আছে; তাহাদের মধ্যে কতকগুলি স্থলচর, অর্থাৎ কেবল স্থলে থাকে; কতকগুলি জলচর, অর্থাৎ কেবল জলে থাকে; আর কতকগুলি স্থল ও জল উভয় স্থানেই থাকে, উহাদিগকে উভচর বলা যাইতে পারে।

যাবতীয় জন্তুর মধ্যে মনুষ্য সর্বপ্রধান। আর সমুদয় জন্তুমনুষ্য অপেক্ষায় নিকৃষ্ট। তাহারা কোনও ক্রমে বুদ্ধি ও ক্ষমতালব্ধে মনুষ্যের তুল্য নহে।

যে সকল জন্তুর শরীরের চর্ম রোমশ, অর্থাৎ রোমে আবৃত, এবং যাহারা চারি পায়ে চলে, তাহাদিগকে পশু বলে; যেমন গো, অশ্ব, গর্দভ, ছাগল, মেঘ, মহিষ, কুকুর, বিড়াল ইত্যাদি। পশুর চারি পা, এ জন্য পশুদিগকে চতুষ্পদ জন্তু বলে। কতকগুলি পশুর পায়ে খুর আছে; যেমন গো, অশ্ব, মেঘ, মহিষ, ছাগল গর্দভ প্রভৃতির। কোনও কোনও পশুর খুর অখন্ডিত, অর্থাৎ জোড়া; যেমন ঘোড়ার। কতকগুলির খুর দুই খণ্ডে বিভক্ত; যেমন গো, মেঘ, ছাগল প্রভৃতির। কোনও কোনও পশুর পায়ে খুর নাই, নখ আছে; যেমন বিড়াল, কুকুর, সিংহ, ব্যাঘ্র, প্রভৃতির। কোনও কোনও পশুর লোম অনেক কাজে লাগে। মেঘের লোমে কস্মল; বনাত প্রভৃতি প্রস্তুত হয়; তিব্বত দেশীয় ছাগলের লোমে শাল হয়।

জন্তুর মধ্যে পক্ষীজাতি দেখিতে অতি সুন্দর। তাহাদের সর্বাঙ্গ পালকে ঢাকা। পক্ষীর দুই পাশে দুটি পক্ষ অর্থাৎ ডানা আছে; উহা দ্বারা উড়িতে পারে, অনেক দূর গেলেও ক্লেশবোধ হয় না। পক্ষীর দুটি পা আছে; তাহা দ্বারা চলিতে পারে, এবং বৃক্ষের শাখায় বসিতে পারে। কোনও কোনও পক্ষী অতিশয় ক্ষুদ্র; যেমন চড়ুই, বাবুই ইত্যাদি। পক্ষীরা খড়, কুটা, তৃণ প্রভৃতি আহরণ করিয়া, অতি পরিষ্কৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাসা প্রস্তুত করে। কাক, কোকিল, পারাবত প্রভৃতি কতকগুলি পক্ষীর আকার কিছু বৃহৎ। হংস, সারস প্রভৃতি কতকগুলি পক্ষী জলে খেলা করে ও সাতার দিতে ভাল বাসে; ইহারা জলচর পক্ষী। সকল পক্ষী আপন আপন বাসায় ডিম পাড়ে। কিছুদিন ডানায় ঢাকিয়া গরমে রাখিলে, ডিমের ভিতর হইতে ছানা বাহির হয়। ইহাকেই ডিমে তা দেওয়া ও ডিম ফুটান কহে।

মৎস্য একপ্রকার জন্তু। ইহারা জলে থাকে। মৎস্যের শরীর ছালে আচ্ছাদিত। এ ছালের উপর মসৃণ, চিক্কণ, শব্দ অর্থাৎ আইস আছে। বুয়াল, মাগুর প্রভৃতি কতকগুলি মৎস্যের ছালে আইস নাই। মৎস্যের দুই পাশে যে পাখনা আছে, তাহার বলে জলে ভাসে। মৎস্যেরা অতি বেগে সাতার দিতে পারে, এবং জলের ভিতর দিয়া গিরা বীটপ অন্য অন্য ভক্ষ্য বস্তু ধরে।

আর একপ্রকার জন্তু আছে, তাহাদের সরীসৃপ কহে; যেমন সাপ, গোসাপ, টিকটিকি, গিরগিরিটি, বেঙ ইত্যাদি।

সর্প-প্রভৃতি কতকগুলি সরীসৃপের পা নাই, বৃকে ভর দিয়া চলে। সর্পের শরীরের চর্ম অতি মসৃণ ও চিক্কণ। ডেক, কচ্ছপ, গোসাপ, টিকটিকি প্রভৃতি কতকগুলি সরীসৃপের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পা আছে; উহারা তাহা দ্বারা চলে। তেজজাতি অতি নিরীহ। কৌতুক ও আমোদের

নিমিস্ত, উহাদিগকে ক্রেশ দেওয়া উচিত নহে। কেহ কেহ এমন নিষ্ঠুর যে, ডেক দেখিলেই ডেলা মারে ও যক্ষিপ্রহার করে।

পতঙ্গজাতি একপ্রকার জন্তু। পতঙ্গ নানাবিধ। গ্রীষ্ম ও বর্ষা কালে ফড়িঙ, মর্শা, মাছি প্রজাপতি প্রভৃতি বহুবিশ পতঙ্গ উড়িয়া বেড়ায়। কোনও কোনও পতঙ্গ-জাতি, সময়ে সময়ে অত্যন্ত ক্রেশকর হইয়া উঠে। পতঙ্গগণ পক্ষী, মৎস্য প্রভৃতি জন্তুর আহার।

কীট অতি ক্ষুদ্র জন্তু। কীট নানাবিধ। উকুন, ছারপোকা, পিপিলিকা, উই, ঘুণ প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীটজাতি।

এ সমস্ত ভিন্ন আরও অনেকবিধ জন্তু আছে। তাহারা এত ক্ষুদ্র যে, অণুবীক্ষণ ব্যতিরেকে, কেবল চক্ষুতে দেখতে পাওয়া যায় না। তাহারা, স্ব স্ব প্রকৃতি অনুসারে, জলে ও স্থলে অবস্থিতি করে।

সমস্ত জগৎ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ প্রাণিসমূহে পরিবৃত। অবশ্যই কোনও উদ্দেশ্যে সিন্দ করিবার নিমিস্ত, সমস্ত প্রাণী সৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু সেই উদ্দেশ্য কি, অনেক স্থলে, তাহার নির্ণয় করিতে পারা যায় না।

জগতে কত জীব আছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু, সৃষ্টিকর্তার কি অপার মহিমা! তিনি সমস্ত জীবের প্রতিদিনের পর্যাপ্ত আহারের যোজনা করিয়া রাখিয়াছেন।

অধিকাংশ জন্তু, লতা, পাতা, ফল, মূল, ঘাস খাইয়া প্রাণধারণ করে। কতকগুলি জন্তু, আপন অপেক্ষা ক্ষুদ্র ও দুর্বল জন্তুর প্রাণবধ করিয়া, তাহাদের মাংস খায়। উহাদিগকে স্থাপদ অর্থাৎ শিকারি জন্তু বলে।

অশ্ব, গো, গর্দভ, কুকুর, বিড়াল প্রভৃতি জন্তু লোকালয়ে থাকে, এবং মানুষে যাহা দেয়, তাহাই খাইয়া প্রাণধারণ করে। এই সকল জন্তুকে গ্রাম্য পশু বলে। গ্রাম্য পশুরা অতি শাস্ত্রমতাব, মনুষ্যের অনেক উপকারে আইসে।

কোন জন্তু কোন প্রেণীতে নিবিষ্ট, তাহার কি নাম, বিশেষরূপে জানা অতি আবশ্যিক। কোন জন্তুকেই অযথা নামে ডাকা উচিত নহে; যাহার যে নাম তাহাকে, সেই নামে ডাকা কর্তব্য। কোনও কোনও ব্যক্তি ফড়িঙকে পশু বলে; কিন্তু ফরিঙ পশু নয়, পতঙ্গ। যে সকল জন্তুর চারি পা, তাহাদিগকে চতুষ্পদ বলে। পক্ষী চতুষ্পদ নহে, কারণ উহার দুটি বই পা নাই; এজন্য, উহাকে, চতুষ্পদ না বলিয়া, দ্বিপদ করা উচিত।

ঈশ্বর, কি অতিপ্রায়ে কোন জন্তুর সৃষ্টি করিয়াছেন, আমরা তাহা অবগত নহি; এজন্য কতকগুলিকে পূজা ও পবিত্র জ্ঞান করি, আর কতকগুলিকে ঘৃণা করি। কিন্তু ইহা অন্যায় ও ভ্রান্তিমূলক। বিশ্বকর্তা ঈশ্বরের সন্নিধান, সকল জন্তুই সমান। অতএব, আমাদেরও ঐরূপ জ্ঞান করা উচিত।

পশুদের মধ্যে পদমর্যাদা নাই। লোকে সিংহকে মৃগেন্দ্র অর্থাৎ পশুর রাজা বলে। কিন্তু উহা কদাচ ঈশ্বরের অভিপ্রেত নহে। সকল পশু অপেক্ষা সিংহের সাহস ও বিক্রম অধিক; এই নিমিস্ত, মানুষোরা উহাকে ঐ উপাধি দিয়াছে; নচেৎ সিংহ অন্য অন্য পশু অপেক্ষা কোনও মতে উৎকৃষ্ট নহে।

মানবজাতি

মানবজাতি, বৃষ্টি ও ক্ষমতাসে, সকল জন্তু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তাহাদের বৃষ্টি ও বিবেচনাশক্তি আছে; এজন্য সর্ববিধ জন্তুর উপর আধিপত্য করে। মানুষ, পশুর ন্যায়, চারি পায়ে চলে না, দুই পায়ে উপর ভর দিয়া সোজা হইয়া দাঁড়ায়। মানুষের দুই হাত, দুই পা। দুই হাত দিয়া, ইচ্ছামত সকল কর্ম করিতে পারে। দুই পা দিয়া ইচ্ছাকৃত সর্বত্র যাতায়াত করিতে পারে। মানুষ, দুই হস্ত দ্বারা, আহারসামগ্রী আহরণ করে, গৃহসামগ্রী ও পরিধানবস্ত্র প্রস্তুত করিয়া লয়, গৃহনির্মাণ করিয়া, তাহাতে বাস করে। গৃহের মধ্যে বাস করে, এজন্য মানুষকে রৌদ্র, বৃষ্টি, ঝড় প্রভৃতিতে ক্রেশ পাইতে হয় না।

মনুষ্যজাতি একাকী থাকিতে ভাল বাসে না। তাহারা পিতা-মাতা, ভ্রাতা, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা প্রভৃতি পরিবারবর্গের মধ্যগত ও প্রতিবেশিমণ্ডলে বেষ্টিত হইয়া বাস করে। এরূপও দেখিতে পাওয়া যায়, কোনও কোনও ব্যক্তি লোকালয় ছাড়িয়া, অরণ্যে বাস করে, কিন্তু ভাদৃশ লোক অতি বিরল। অধিকাংশ, লোকই, গ্রামে ও নগরে, পরস্পরের নিকট, বাটী নির্মাণ করিয়া অবস্থিতি করে। যেখানে অল্প লোক বাস করে, তাহার নাম গ্রাম। যেখানে বহুসংখ্যক লোকের বাস, তাহাকে নগর বলে। যে নগরে রাজার বাস অথবা রাজকীয় প্রধান স্থান থাকে, তাহাকে রাজধানী বলে; যেমন কলিকাতা পশ্চিম বঙ্গের রাজধানী।

মনুষ্যেরা গ্রামে ও নগরে, একত্র হইয়া, বাস করে। ইহার তাৎপর্য এই; তাহাদের পরস্পর সাহায্য হইতে পারিবেক ও পরস্পর দেখা শূনা ও কথাবার্তায় সুখে কালাযাপন হইবেক। যে লোক যে দেশে বাস করে, তাহাকে সে দেশের নিবাসী বলে। দেশের সমস্ত নিবাসী লোক লইয়া এক জাতি হয়। পৃথিবীতে নানা দেশ ও নানা জাতি আছে।

লোক মাত্রেরই জনাত্মমিষটিত এক এক উপাধি থাকে; ঐ উপাধি দ্বারা তাহাদিগকে অন্য দেশীয় লোক হইতে পৃথক বলিয়া জানা যায়। বাঙ্গালা দেশে আমাদের নিবাস; এই নিমিস্ত, আমাদেরকে বাঙ্গালি বলে। এইরূপ উড়িষ্যা দেশের নিবাসী লোকদিগকে উড়িয়া বলে; মিজোর নিবাসীদিগকে মৈথিল; ইন্দোরে নিবাসীদিগকে ইংরেজ।

জন্তু সকল, দিনের বেলায় আপন আপন কর্ম করে, রাত্রিকালে নিদ্রা যায়। নিদ্রা যাইবার সময়, তাহারা শয়ন করে ও নয়ন মুদ্রিত করিয়া থাকে। অশ্ব প্রভৃতি কতকগুলি জন্তু দাঁড়াইয়া নিদ্রা যায়। শশ প্রভৃতি কতকগুলি জন্তু চক্ষু না মুদ্রিয়া, নিদ্রা যাইতে পারে।

আমরা, নিদ্রা যাইবার সময়, কখনও কখনও স্বপ্ন দেখি। স্বপ্ন সকল অমূলক চিন্তা মাত্র, কার্য্যকারক নহে। জন্তু সকল যখন নিদ্রা যায়, তখন উহাদিগকে নিদ্রিত বলে, যখন নিদ্রা না যাইয়া জাগিয়া থাকে, তখন উহাদিগকে জাগরিত বলে।

মনুষ্য ভিন্ন সকল জন্তুই কাঁচা বস্তু খাইয়া থাকে। ছাগ, গো, মহিষ প্রভৃতি জন্তু সকল মাঠের কাঁচা ঘাস খায়। সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি স্থাপদেতা, কোনও জন্তু মারিয়া, তৎক্ষণাৎ তাহার কাঁচা মাংস খাইয়া ফেলে। পক্ষিগণ, জিয়ন্ত কীট পতঙ্গ ধরিয়া,

তৎক্ষণাৎ ভক্ষণ করে। মনুষ্যেরা কাঁচা বস্তু খায় না, খাইলে পরিপাক হয় না, পীড়াদায়ক হয়। তাহারা প্রায় সকল বস্তুই, অগ্নিতে পাক করিয়া খায়। ভাল পাক হইলে ভক্ষ্য বস্তু সুমাদু ও শরীরের পুষ্টিকর হয়।

জন্তুগণ যখন সচ্ছন্দ শরীরে, আহার-বিহার করিয়া বেড়ায়, তখন তাহাদিগকে সুস্থ বলা যায়। আর যখন তাহাদের পীড়া হয়, সচ্ছন্দে আহার-বিহার করিতে পারে না, সর্বদা শূইয়া থাকে, ঐ সময়ে তাহাদিগকে অসুস্থ বলে। মনুষ্যের পীড়া হইবার অধিক সম্ভাবনা। পীড়া হইলে চিকিৎসকেরা, ঔষধ, পথ্য প্রভৃতির যে ব্যবস্থা করেন, সকলেরই ঐ ব্যবস্থা অনুসারে চলা উচিত ও আবশ্যিক। যাহারা ঐ ব্যবস্থা অনুসারে চলে, তাহারা অধিক ক্লেশ পায় না, তুরায় রোগমুক্ত ও সুস্থ হইয়া উঠে। যাহারা চিকিৎসকের ব্যবস্থায় অবহেলা করে, তাহারা বিস্তর ক্লেশ পায় এবং অনেক মরিয়া যায়।

কোনও কোনও জন্তু অধিক কাল বাঁচে, কোনও কোনও জন্তু অল্পকাল বাঁচে। হস্তী প্রায় একশত বৎসর বাঁচে। ঘোড়া প্রায় কুড়ি বৎসর বাঁচে। কুকুর প্রায় চৌদ্দ পনের বৎসর বাঁচে। অধিকাংশ কীট পতঙ্গ প্রায় এক বৎসরের অধিক বাঁচে না। কোনও কোনও কীট এক ঘণ্টা মাত্র বাঁচে। অতি ক্ষুদ্রজাতীয় মশা, সূর্যের আলোকে অল্পকাল মাত্র খেলা করিয়া, ভূতলে পড়ে ও প্রাণত্যাগ করে। মনুষ্যজাতি, প্রায় সমুদায় জন্তু অপেক্ষা, অধিক কাল বাঁচে।

মরণের অবধারিত কাল নাই। অনেক প্রায় ষাট বৎসরের মধ্যে মরিয়া যায়। যাহারা সন্তর, আশি, নব্বই অথবা এক শত বৎসর বাঁচে, তাহাদিগকে, লোকে দীর্ঘজীবী বলে। কিন্তু অনেকেই শৈশব কালে মরিয়া যায়। এক্ষণে যাহারা নিতান্ত শিশু আছে, তাহারাও তাহাদের পিতা, মাতা, পিতামহীর ন্যায়, বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত বাঁচিতে পারে, কিন্তু চিরজীবী হইবেক না। কেহই অমর নহে, সকলকেই মরিতে হইবেক।

জন্তু সকল মরিলে তাহাদের শরীরে প্রাণ ও চেতনা থাকে না। তখন উহারা আর, পূর্বের মত দেখিতে, শুনিতে, চলিতে, বলিতে কিছুই পারে না; কেবল অচেতন স্পন্দনই জড় পদার্থ মাত্র পড়িয়া থাকে। মৃত শরীর বিদ্যুৎ ও বিবর্ণ হইয়া যায়, দেখিলে অত্যন্ত দুঃখ জন্মে, এজন্য লোকে অবিলম্বে তাহা দগ্ধ করে। কোনও কোনও জাতি দাহ করে না, মাটিতে পুতিয়া ফেলে।

মনুষ্য শৈশবকালে অতি অজ্ঞ থাকে, ক্রমে ক্রমে যত বড় হয়, উপদেশ পাইয়া নানা বিষয় শিখিতে আরম্ভ করে। আমরা এই যে পৃথিবীতে বাস করিতেছি, ইহা, কত বড়, ইহার আকার কেমন শিশুরা তাহার কিছুই জানে না। অধিক কি, তাহাদের কি নাম, কোন হাত ডান, কোন হাত বাঁ, শিখাইয়া না দিলে ইহাও জানিতে পারে না।

বালকেরা সকল বিষয়ে অজ্ঞ বলিয়া, তাহাদিগকে শিক্ষার্থে পাঠশালায় পাঠান যায়। যাহারা বাল্যকালে যত্ন পূর্বক বিদ্যাভ্যাস করে, তাহারা মনের সুখে কালযাপন করে।

আর, যাহারা বিদ্যাভ্যাসে আলসা ও অবহেলা করিয়া কেবল খেলিয়া বেড়ায়, তাহারা মূর্খ হয় ও যাবজ্জীবন দুঃখ পায়।

ইন্দ্রিয়

ইন্দ্রিয় জ্ঞানের দ্বারম্বরূপ, অর্থাৎ ইন্দ্রিয় দ্বারা সর্ববিধ জ্ঞান জন্মে। ইন্দ্রিয় না থাকিলে, আমরা কোনও বিষয়ে কিছু মাত্র জানিতে পারিতাম না। মনুষ্যের পাঁচ ইন্দ্রিয়। সেই পাঁচ ইন্দ্রিয় এই; চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক। চক্ষু দ্বারা যে জ্ঞান জন্মে, তাহাকে দর্শন বলে; কর্ণ দ্বারা যে জ্ঞান জন্মে, তাহাকে শ্রবণ; নাসিকা দ্বারা যে জ্ঞান জন্মে, তাহাকে আশ্রাণ; জিহ্বা দ্বারা যে জ্ঞান জন্মে, তাহাকে আশ্বাদন; ত্বক দ্বারা যে জ্ঞান জন্মে তাহাকে স্পর্শ বলে।

চক্ষু

চক্ষু দর্শনেন্দ্রিয়। চক্ষু দ্বারা সকল বস্তুর দর্শন নিশ্চয় হয়। চক্ষু না থাকিলে কোন বস্তুর কেমন আকার, কোন বস্তু সাদা, কোন বস্তু কাল, কিছুই জানিতে পারিতাম না। যেখানে আলোক থাকে, সেখানে চক্ষুতে দেখা যায়; যেখানে গাঢ় অন্ধকার, কিছুই আলোক নাই, সেখানে কিছুই দেখা যায় না। রাত্রিকালে, চন্দ্র ও নক্ষত্র দ্বারা, অতি অল্প আলোক হয়; এ নিমিস্ত, বড় স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় না। দিনের বেলায় সূর্যের আলোক থাকে, এজন্য অতি সুন্দর দেখিতে পাওয়া যায়। রাত্রিতে প্রদীপ জ্বালিলে বিলক্ষণ আলোক হয়, তখন উত্তম দেখিতে পাওয়া যায়।

চক্ষু অতি কোমল পদার্থ, অল্পেই নষ্ট হইতে পারে; এজন্য চক্ষুর উপর দুইখানি আবরণ আছে। ঐ আবরণকে চক্ষুর পাতা বলে। চক্ষুতে আঘাত লাগিবার, অথবা কিছু পড়িবার, আশঙ্কা হইলে আমরা পাতা দিয়া চক্ষু ঢাকিয়া ফেলি। চক্ষুর পাতার ধারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রোম আছে, তাহাতেও চক্ষুর অনেক রক্ষা হয়। ঐ রোমের নাম পশ্ম। পশ্ম আছে বলিয়া চক্ষুতে ধূলা, কুটা, কীট প্রভৃতি পড়িতে পায় না, এবং সূর্যের উত্তাপ অধিক লাগে না।

যাহার দুই চক্ষু নাই, সে অন্ধ। অন্ধ কিছুই দেখিতে পায় না। সে কোথাও যাইতে পারে না। যাইতে হইলে, এক জন তাহার হাত ধরিয়া লইয়া যায়; নতুবা সে পড়িয়া মরে। অন্ধ হওয়া বড় ক্লেশ। যাহার এক চক্ষু নাই, তাহাকে কাণা বলে। কাণা এক চক্ষু দ্বারা দেখিতে পায়। কাণাকে অন্ধের মত ক্লেশ পাইতে হয় না।

অক্ষিপোলকের সম্মুখভাগে যে গোলাকৃতি অংশ কৃষ্ণবর্ণ দেখায়, ঐ অংশ কাচের ন্যায় স্বচ্ছ। উহার পচাতে, পর পর, কাচের ন্যায় স্বচ্ছ আর তিনটি অংশ আছে। তৎপরে আর একটি অংশ আছে; উহা কোমল পাতলা পদার্থ। স্নায়ু দ্বারা মস্তিষ্কের সহিত, এই কোমল পাতলা পদার্থের যোগ আছে। আমরা যে বস্তু দেখি, সে বস্তু হইতে আলোক

আসিয়া, ঐ সকল মৃচ্ছ অংশ ভেদ করিয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। তখন ঐ কোমল পাতলা পদার্থের উপর সেই বস্তুর ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি আবির্ভূত হয়; এবং স্নায়ু দ্বারা, মস্তিষ্কের সহিত ঐ কোমল পাতলা পদার্থের যোগ আছে বলিয়া দর্শনজ্ঞান জন্মে।

কর্ণ

কর্ণ দ্বারা সকল শব্দের শ্রবণ হয়; এ নিমিত্ত, কর্ণকে শ্রবণেন্দ্রিয় বলে। কর্ণ না থাকিলে, আমরা কিছুই শুনিতে পাইতাম না। শব্দ সকল প্রথমত, কর্ণকুহরে প্রবেশ করে। কর্ণকুহরে পটহের মত যে, অতি পাতলা এক খণ্ড চর্ম আছে, তাহাতে ঐ সকল শব্দের প্রতিঘাত হয়, এবং তাহাতেই শ্রবণজ্ঞান নিম্পন্ন হইয়া থাকে। কোনও কোনও লোক এমন দুর্ভাগ্য যে, তাহাদের শ্রবণশক্তি নাই; তাহাদিগকে বধির অর্থাৎ কালা বলে; কেহ কিছু কহিলে, অথবা কোনও শব্দ করিলে, কালারা শুনিতে পায় না।

নাসিকা

নাসিকাকে ঘ্রাণেন্দ্রিয় বলে। নাসিকা দ্বারা গন্ধের আঘ্রাণ পাওয়া যায়। নাসিকা না থাকিলে কি ভাল কি মন্দ কোনও গন্ধের আঘ্রাণ পাওয়া যাইত না। নাসিকারস্তের অভ্যন্তরে কতকগুলি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম স্নায়ু সঞ্চারিত আছে। ঐ সকল স্নায়ু দ্বারা গন্ধের আঘ্রাণ পাওয়া যায়। যে গন্ধের আঘ্রাণে মনে প্রীতি জন্মে, তাহাকে সুগন্ধ ও সৌরভ বলে। যে গন্ধের আঘ্রাণে অসুখ ও ঘৃণাবোধ হয়, তাকে দুর্গন্ধ বলে। চন্দন ও গোলাপের গন্ধ সুগন্ধ। কোনও বস্তু পড়িলে যে গন্ধ হয়, তাহাকে দুর্গন্ধ বলে।

জিহ্বা

জিহ্বা দ্বারা সকল বস্তুর আস্বাদ পাওয়া যায়; এজন্য জিহ্বাকে রসেন্দ্রিয় বলা হয়। রসন শব্দের অর্থ আস্বাদন। জিহ্বার অন্য এক নাম রসনা। জিহ্বা না থাকিলে আমরা কোনও বস্তুর আস্বাদ বুঝিতে পারিতাম না। জিহ্বার অগ্রভাগে কতকগুলি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম স্নায়ু সম্বন্ধ আছে। মুখের ভিতর কোনও বস্তু দিলে, ঐ সকল স্নায়ু দ্বারা তাহার সাদৃশ্য হয়।

বস্তুর আস্বাদ নানাবিধ। পুড়ের আস্বাদ মিষ্ট। তৈলুল অম্ল বোধ হয়। নিম চিরতা তিক্ত লাগে। যাহা খাইতে ভাল লাগে, তাহাকে সুস্বাদু বলে; যাহা মন্দ লাগে, তাহাকে বিষাদ বলে। কোনও কোনও বস্তুর কিছুই আস্বাদ নাই; মুখে দিলে না অম্ল, না মিষ্ট, না তিক্ত, না কটু, কিছুই বোধ হয় না; যেমন গৈদ, চুয়ান জল ইত্যাদি।

ত্বক

ত্বক স্পর্শেন্দ্রিয়। ত্বক দ্বারা স্পর্শ জ্ঞান জন্মে। ত্বক সকল শরীর ব্যাপিয়া আছে এবং সমস্ত ত্বকেই স্নায়ু সঞ্চারিত আছে; এজন্য শরীরের সকল অংশেই স্পর্শজ্ঞান হইয়া

থাকে। কিন্তু, সকল অঙ্গ অপেক্ষা, হস্তই স্পর্শজ্ঞানের প্রধান সাধন। অঙ্গগুলির অগ্রভাগে যে অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম স্নায়ু আছে, তাহা দ্বারা অতি উত্তম স্পর্শজ্ঞান হয়। অম্বকারে যখন দেখিতে পাওয়া যায় না, তখন হস্ত ও অন্য অন্য অবয়ব দ্বারা স্পর্শ করিয়া প্রায় সকল বস্তু জ্ঞানিতে পারা যায়। বায়ু দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু স্পর্শেন্দ্রিয় দ্বারা উহার অনুভব হয়।

এই পাঁচ ইন্দ্রিয় জ্ঞানের পথ স্বরূপ। ইন্দ্রিয়পথ দ্বারা আমাদের মনে জ্ঞানের সঞ্চারণ হয়। ইন্দ্রিয়বিহীন হইলে, আমরা সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞান থাকিতাম। এই সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বিনিয়োগ দ্বারা অভিজ্ঞতা জন্মে। অভিজ্ঞতা জন্মিলে, ভাল, মন্দ, হিত, অহিত, এই সমস্ত বিবেচনা করিবার শক্তি হয়। অতএব ইন্দ্রিয় মানুষের পক্ষে অশেষ প্রকারে উপকারক।

মনুষ্যের ন্যায় পশু, পক্ষী ও অন্য অন্য জন্তুরও এই সকল ইন্দ্রিয় আছে। কিন্তু তাহাদের কোনও কোনও ইন্দ্রিয়, মনুষ্যের অপেক্ষা অধিক প্রবল। বিড়ালের শ্রবণশক্তি অনেক অধিক। কোনও কোনও কুকুরজাতির ঘ্রাণশক্তি অতিশয় প্রবল। এরূপ হইবার তাৎপর্য্য এই যে, বিড়ালের শ্রবণশক্তি অধিক না হইলে, অম্বকারময় স্থানে মূষিক প্রভৃতির সঞ্চারণ বুঝিতে পারিত না। কোনও কোনও কুকুরজাতি, পলায়িত পশুর গাত্রগন্ধের আঘ্রাণ অনুসারে, তাহার অনুেষণ করিয়া লয়। ঘ্রাণশক্তি এত অধিক না হইলে, তাহারা সহজে শিকার করিতে পারিত না। কোনও কোনও কুকুরজাতি, আঘ্রাণ দ্বারা শিকার না করিয়া দৃষ্টি দ্বারা শিকার করে। ইহাদের দর্শনশক্তি অতিশয় প্রবল। যে পশুর অনুসরণে প্রবৃত্ত হয়, উহা অধিক দূরবর্তী হইলেও ইহারা দেখিতে পায়। কিন্তু যেখানে ঘোর অম্বকার, কিছুমাত্র আলোক নাই, সেখানে বিড়াল মনুষ্য অপেক্ষা, অধিক দেখিতে পায় না।

এইরূপ যে জন্তুর যে ইন্দ্রিয়ের যেরূপ শক্তি আবশ্যিক, ঐ জন্তুর তাহাকে তাহাই দিয়াছেন। তিনি কাহারও কোনও বিষয়ে ন্যূনতা রাখেন নাই।

বাক্যকথন-ভাষা

মনুষ্যেরা মুখ দ্বারা শব্দের উচ্চারণ করিয়া মনের ভাব ব্যক্ত করে। শব্দের উচ্চারণ বিষয়ে জিহ্বাই প্রধান সাধন। শব্দের উচ্চারণকে কথা কহা বলে, এবং উচ্চারিত শব্দের নাম ভাষা। যে শক্তি দ্বারা শব্দের উচ্চারণ নিম্পন্ন হয়, তাহাকে বাকশক্তি বলে।

পশু, পক্ষী ও অন্য জন্তুদিগের বাকশক্তি নাই। তাহাদের মনে কখনও কখনও কোনও কোনও ভাবের উদয় হয় বটে; কিন্তু উহারা, মনুষ্যের মত কথা কহিয়া, তাহা ব্যক্ত করিতে পারে না; কেবল একপ্রকার অব্যক্ত শব্দ ও চীৎকার করে। মেঘ, মহিষ, গো, গর্দভ, কুকুর, বিড়াল, ছাগল, পশু, পক্ষী, ভেদ প্রভৃতি জন্তু সকল এক এক প্রকার

শব্দ করে। এ সকল শব্দ দ্বারা তাহারা হর্ষ, বিষাদ, রোষ, অভিলাষ প্রভৃতি মনের ভাব ব্যক্ত করে। কিন্তু যে সকল অব্যয় শব্দ বুদ্ধিতে পারা যায় না; এজনা ঐ সকল শব্দকে ভাষা বলে না; শূক প্রভৃতি কতকগুলি পক্ষীকে শিখাইলে, উহারা মনুষ্যের মত, স্পষ্ট শব্দের উচ্চারণ করিতে থাকে।

চিন্তা ও বাকশক্তির অভাবে পশু; পক্ষী ও আর জন্তুদিগকে, মনুষ্য অপেক্ষা অনেক হীন অবস্থায় থাকিতে হইয়াছে। তাহাদের কোথায় জ্ঞান, কত বয়স, কি নাম, কাহার কি অবস্থা ইত্যাদি কোনও বিষয় পরস্পর জানাইতে পারে না; সুতরাং তাহারা পরস্পর শিক্ষা দিতে অক্ষম এবং আপনাদিগকে সুখী ও সচ্ছন্দ করিবার নিমিত্ত, কোনও উপায় করিতেও সমর্থ নয়। ফলতঃ মনুষ্য ভিন্ন আর সকল জন্তুকেই ঈরকাল এই হীন অবস্থায় থাকিতে হইবেক; এবং মনুষ্যেরা অন্যায়সে তাহাদিগকে পরাভূত ও বশীভূত করিতে পারিবেক।

আমাদের বাকশক্তি ও চিন্তাশক্তি উভয়ই আছে। মনে যে বিষয়ের চিন্তা করি, জিহ্বা দ্বারা তাহার উচ্চারণ করিতে পারি। জিহ্বা ও কণ্ঠনালী এ উভয়কে বাগিন্দ্রিয় বলে। জিহ্বা দ্বারা উচ্চারণ সম্পন্ন হয়, কণ্ঠনালী দ্বারা শব্দ নির্গত হয়। কোনও কোনও লোক এমন হতভাগ্য যে, কথা কহিতে পারে না; উহাদিগকে মূক অর্থাৎ বোবা বলে।

সকল ব্যক্তিই অতি শৈশব কালে কথা কহিতে শিখে। প্রথম কথা কহিতে শিখা সজাতীয় লোকের নিকটে হয়; এ নিমিত্ত, প্রথম শিখিত ভাষাকে জাতিভাষা বলে।

সকলেরই স্পষ্টরূপে কথা বলিতে চেষ্টা করা উচিত; তাহা হইলে সকলে অন্যায়সে বুদ্ধিতে পারে। আর যখন যাহা বলিবে, সত্য বই মিথ্যা বলিবে না। মিথ্যা বলা বড় দোষ; মিথ্যা বলিলে কেহ বিশ্বাস করে না; সকলেই ঘৃণা করে। কি বালক কি বৃদ্ধ, কি ধনবান কি দরিদ্র, কাহারও অঙ্গীল ও অসাধু ভাষা মুখে আনা উচিত নহে। কি ছোট, কি বড় সকলকেই প্রিয় ও মিষ্ট বাক্য বলা উচিত। রূঢ় ও কর্কশ বাক্য বলিয়া, কাহারও মনে বেদনা দেওয়া উচিত নহে।

সকল দেশেই ভাষা পৃথক পৃথক। না শিখিলে, এক দেশের লোক অন্যদেশীয় লোকের ভাষা বুদ্ধিতে পারে না। আমরা যে ভাষা বলি, তাহাকে বাঙালা বলে। কাশী অঞ্চলে লোকে যে ভাষা বলে, তাহাকে হিন্দী বলে। পারস্য দেশের লোকের ভাষা পারসী। আরব দেশের ভাষা আরবী। হিন্দী ভাষাতে আরবী ও পারসী কথা মিশ্রিত হইয়া, এক ভাষা প্রস্তুত হইয়াছে, তাহাকে উর্দু বলে। উর্দুকে মতঙ্গ ভাষা বলা যাইতে পারে না। কতকগুলি আরবী ও পারসী কথা ভিন্ন উহা সর্ব প্রকারেই হিন্দী। ইংলণ্ডীয় লোকের অর্থাৎ ইংরেজদিগের ভাষা ইংরেজী।

ইংরেজরা এক্ষণে আমাদের দেশের রাজা; সুতরাং ইংরেজী আমাদের রাজভাষা। এ নিমিত্ত, সকলে আগ্রহ পূর্বক ইংরেজী শিখে। কিন্তু অগ্রে জাতিভাষা না শিখিয়া পরের ভাষা শিখা কোনও মতে উচিত নহে।

পূর্বকালে, ভারতবর্ষে যে ভাষা প্রচলিত ছিল, তাহার নাম সংস্কৃত। সংস্কৃত অতি প্রাচীন ও উৎকৃষ্ট ভাষা। এ ভাষা এখন আর চলিত ভাষা নহে। কিন্তু ইহাতে অনেক ভাল ভাল গ্রন্থ আছে। সংস্কৃত ভাল না জানিলে; হিন্দী, বাঙালা প্রভৃতি ভাষাতে উত্তম বুৎপত্তি জন্মে না।

কাল

প্রভাত ও সন্ধ্যা কাহাকে বলে, তাহা সকলেই জানে। যখন আমরা শয্যা হইতে উঠি, সূর্য্যের উদয় হয়, ঐ সময়কে প্রভাত বলে। যখন সূর্য্য অস্ত যায়, অন্ধকার হইতে আরম্ভ হয়, ঐ সময়কে সন্ধ্যা বলে। প্রভাত অবধি সন্ধ্যা পর্য্যন্ত যে সময় তাহাকে দিবাভাগ বলে; আর সন্ধ্যা অবধি প্রভাত পর্য্যন্ত যে সময় তাহাকে রাত্রি বলে। দিবাভাগে সকল জীব জাগরিত থাকে ও আপন কর্ম করে। রাত্রিকালে সকলে আরাম করে ও নিদ্রা যায়। দিবাভাগের প্রথম ভাগকে পূর্বাহ্ন, মধ্য ভাগকে মধ্যাহ্ন, শেষ ভাগকে অপরাহ্ন, ও সায়াহ্ন বলে।

দিবা ও রাত্রি এই দুয়ে এক দিবস হয়; অর্থাৎ এক প্রভাত অবধি আর এক প্রভাত পর্য্যন্ত যে সময়, তাহাকে দিবস বলে। দিবসকে ষাট ভাগ করিলে, ঐ এক এক ভাগকে এক এক দণ্ড বলে। আড়াই দণ্ডে এক হোরা; তিন হোরাতে অর্থাৎ সাড়ে সাত দণ্ডে, এক প্রহর; আট প্রহরে এক দিবস; পনের দিবসে এক পক্ষ হয়। দুই পক্ষ, শুরু ও কৃষ্ণ। যখন চন্দ্রের বৃষ্টি হইতে থাকে, তাহাকে শুরু পক্ষ বলে। আর, যখন চন্দ্রের দ্বাস হইতে থাকে, তাহাকে কৃষ্ণ পক্ষ বলে। দুই পক্ষে, অর্থাৎ ত্রিশ দিনে, এক মাস হয়। দুই মাসে এক ঋতু। সমুদয় ছয় ঋতু; সেই ছয় ঋতু এই; গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত। বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ, এই দুই মাস গ্রীষ্ম ঋতু; আষাঢ় ও শ্রাবণ, এই দুই মাস বর্ষা ঋতু; ভাদ্র ও আশ্বিন এই দুই মাস শরৎ ঋতু; কার্তিক ও অগ্রহায়ণ, এই দুই মাস হেমন্ত ঋতু; পৌষ ও মাঘ, এই দুই মাস শীত ঋতু; ফাল্গুন ও চৈত্র, এই দুই মাস বসন্ত ঋতু। ছয় ঋতুতে, অর্থাৎ বার মাসে এক বৎসর হয়।

সূর্য্যোদয় সকলে বলে, ত্রিশ দিনে এক মাস হয়। কিন্তু সকল মাস সমান হয় না। কোনও মাস আটশ দিনে, কোনও মাস ঊনত্রিশ দিনে, কোনও মাস ত্রিশ দিনে, কোনও মাস একত্রিশ দিনে, কোনও মাস বত্রিশ দিনে হয়। এই নানাবিধ বশতঃ বৎসরে তিন শত পয়ষষ্টি দিন হইয়া থাকে। সকল মাস ত্রিশ দিনে হইলে, তিন শত ষাট দিনে বৎসর হইত। পূর্বকালের লোকেরা তিন শত ষাট দিনে বৎসরের গণনা করিতেন। সে অনুসারে, অদ্যাপি সামান্য লোকে তিন শত ষাট দিনে বৎসর বলে। মাসের শেষ দিবসকে সংক্রান্তি বলে। চৈত্র মাসের সংক্রান্তিতে, বৎসর সমাপ্ত হয়। বৈশাখ মাসের প্রথম দিবসে; নূতন বৎসরের পর বৎসর আসিতেছে ও যাইতেছে। এইরূপ এক শত বৎসরে এক শতাব্দী হয়।

কোনও সুপ্রসিদ্ধ রাজার অধিকার, অথবা কোনও সুপ্রসিদ্ধ ঘটনা, অবলম্বন করিয়া, বৎসরের গণনা আরম্ভ হইয়া থাকে। এইরূপে যে বৎসরের গণনা করা যায়; তাহাকে শাক বলে। আমাদের দেশে তিন শাক প্রচলিত, সংবৎ, শকাব্দাঃ সাল। বিক্রমাদিত্য নামে এক অতি প্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন; তিনি যে শাক প্রচলিত করিয়া গিয়াছেন, তাহার নাম সংবৎ। আর শালিবাহন রাজা যে শাক প্রচলিত করেন, তাহার নাম শকাব্দ। বিক্রমাদিত্যের ঊনবিংশ শতাব্দী অতীত হইয়াছে; এক্ষণে বিংশ শতাব্দী চলিতেছে। শালিবাহনের অষ্টাদশ শতাব্দী অতীত হইয়াছে, এক্ষণে ঊনবিংশ শতাব্দী চলিতেছে। মুসলমানেরা, মহম্মদের মক্কা হইতে পলায়ন দিবস অবধি, এক শাকের গণনা করেন, উহার নাম হিজিরা। ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধ যোগল সম্রাট আকবর, হিজিরা নামের পরিবর্তে, ঐ শাককে ইলাহী নামে প্রতিষ্ঠিত করেন। উহাই বাঙ্গালাদেশে সাল নামে প্রচলিত হইয়াছে। এক্ষণে, আমাদের দেশে, বিষয় কর্মে, সকল শাক অপেক্ষা সাল অধিক প্রচলিত। এই শাকের দ্বাদশ শতাব্দী অতীত হইয়াছে, এক্ষণে ত্রয়োদশ শতাব্দী চলিতেছে। এইরূপ, ইংরেজ, ফরাসী, জার্মান প্রভৃতি যুরোপীয় জাতিরা, খ্রীষ্টীয়ের জন্ম অবধি, এক শাকের গণনা করেন; উহাকে খ্রীষ্টীয় শাক বলে। খ্রীষ্টীয় শাকের অষ্টাদশ শতাব্দী অতীত হইয়াছে, এক্ষণে ঊনবিংশ শতাব্দী চলিতেছে।

গণন-অঙ্ক

বস্তুর সংখ্যা করিবার ও মূল্য বলিবার নিমিত্ত, গণনা জানা অতিশয় আবশ্যিক। সচরাচর, সকলে কয়েকটি কথা দ্বারা গণনা করিয়া থাকে। যথা—এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ ইত্যাদি। কিন্তু যখন পুস্তকে, অথবা অন্য স্থানে, কেহ কোনও কোনও, বস্তুর সংখ্যাপাত করে, তখন সে ব্যক্তি, এক, দুই ইত্যাদি শব্দ না লিখিয়া, উহাদের স্থলে এক এক অঙ্কপাত করে। ঐ ঐ অঙ্ক দ্বারা সেই সেই শব্দের কার্য নিম্নলিখিত হয়।

অঙ্ক সমুদয়ে দশটি মাত্র। উহাদের আকার ও নাম এই—

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ০

এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় শূন্য

যেমন, বর্ণমালায় কয়েকটি অক্ষরের পরস্পর যোজনা দ্বারা, সকল বিষয় লিখিতে পারা যায় সেইরূপ কেবল এই কয়টি অক্ষরের পরস্পর যোগে, কি ছোট, কি বড়, সংখ্যাই লিখা যায়।

অন্তিম ০ অঙ্ককে শূন্য বলে, অর্থাৎ উহা কিছুই নয়। অন্য নয়টি অঙ্কের আশ্রয় ব্যতিরেকে, কেবল উহা দ্বারা কোনও সংখ্যার বোধ হয় না। কিন্তু, ১ এই অঙ্কের পর বসাইলে, অর্থাৎ এইরূপ ১০ লিখিলে, দশ হয়; ২ এই অঙ্কের পর বসাইলে, ২০ কুড়ি হয়; ৩ এই অঙ্কের পর, ৩০ ত্রিশ; ৪ এই অঙ্কের পর ৪০ চল্লিশ; ৫ এই অঙ্কের পর,

৫০ পঞ্চাশ ইত্যাদি। যদি ১ এই অঙ্কের পর দুই শূন্য বসান যায় অর্থাৎ এইরূপ ১০০ লিখা যায়, তবে তাহাতে এক শত বুঝায়। ১ লিখিয়া তিন শূন্য বসাইলে, অর্থাৎ এইরূপ ১০০০ লিখিলে, সহস্র বুঝায়।

১, ৩, ৫, ৭, ৯ ইত্যাদি অঙ্ককে বিষম অঙ্ক বলে। আর, ২, ৪, ৬, ৮, ১০ ইত্যাদি অঙ্ককে সম অঙ্ক বলে।

অঙ্ক দ্বারা যখন কেবল সংখ্যার বোধ হয়, তখন উহাদিগকে সংখ্যাবাচক বলে। সংখ্যাবাচক শব্দের নাম ও আকার নিম্নে দর্শিত হইতেছে।

১ এক	২৬ ছাব্বিশ	৫১ একান্ন
২ দুই	২৭ সাতাশ	৫২ বাহান্ন
৩ তিন	২৮ আটাশ	৫৩ তিপান্ন
৪ চার	২৯ ঊনত্রিশ	৫৪ চুষান্ন
৫ পাঁচ	৩০ ত্রিশ	৫৫ পঞ্চান্ন
৬ ছয়	৩১ একত্রিশ	৫৬ ছাপান্ন
৭ সাত	৩২ বত্রিশ	৫৭ সাতান্ন
৮ আট	৩৩ তেত্রিশ	৫৮ আটান্ন
৯ নয়	৩৪ চৌত্রিশ	৫৯ ঊনষাট
১০ দশ	৩৫ পঁয়ত্রিশ	৬০ ষাট
১১ এগার	৩৬ ছত্রিশ	৬১ একষষ্টি
১২ বার	৩৭ সাইত্রিশ	৬২ বাষষ্টি
১৩ তের	৩৮ আটত্রিশ	৬৩ তেযষ্টি
১৪ চৌদ্দ	৩৯ ঊনচত্রিশ	৬৪ চৌষষ্টি
১৫ পনের	৪০ চল্লিশ	৬৫ পঁয়ষষ্টি
১৬ ষোল	৪১ একচত্রিশ	৬৬ ছষষ্টি
১৭ সত্তর	৪২ বিয়াত্রিশ	৬৭ সাতষষ্টি
১৮ আঠার	৪৩ তিতাত্রিশ	৬৮ আটষষ্টি
১৯ ঊনিশ	৪৪ চুয়াত্রিশ	৬৯ ঊনসত্তর
২০ কুড়ি, বিশ	৪৫ পঁয়ত্রিশ	৭০ সত্তর
২১ একুশ	৪৬ ছচত্রিশ	৭১ একান্তর
২২ বাইশ	৪৭ সাতচত্রিশ	৭২ বাইসত্তর
২৩ তেইশ	৪৮ আটচত্রিশ	৭৩ তিয়াসত্তর
২৪ চব্বিশ	৪৯ ঊনপঞ্চাশ	৭৪ চুয়াসত্তর
২৫ পঁচিশ	৫০ পঞ্চাশ	৭৫ পঁচাসত্তর

৪ঠা	১২ই	২০শে	২৮শে
পাঁচই	তেরই	একুশে	উনত্রিশে
৫ই	১৩ই	২১শে	২৯শে
ছয়ই	চৌদ্দই	বাইশে	ত্রিশে
৬ই	১৪ই	২২শে	৩০শে
সাতই	পনেরই	তেইশে	একত্রিশে
৭ই	১৫ই	২৩শে	৩১শে
আটই	ষোলই	চব্বিশে	বত্রিশে
৮ই	১৬ই	২৪শে	৩২শে

বর্ণ

নানা বর্ণের বস্তু দেখিলে নয়নের যেরূপ প্রীতি জন্মে, সর্বদা একবর্ণের বস্তু দেখিলে সেদৃশ্য হয় না, বরং বিরক্তিই জন্মে। এ জন্য, জগতের যাবতীয় পদার্থ, এক বর্ণের না হইয়া, নানা বর্ণের হইয়াছে। সকল বর্ণ অপেক্ষা, হরিত বর্ণ অধিক মনোরম ও অধিকক্ষণ দেখিতে পারা যায়; এজন্য জগতে, অন্য অন্য বর্ণের বস্তু অপেক্ষা, হরিত বর্ণের বস্তুই অধিক।

কি স্বাভাবিক, কি কৃত্রিম, সকল পদার্থেই নানাবিধ বর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু যেখানে যত বর্ণ আছে, সকলই তিনটি মাত্র মূল বর্ণ হইতে উৎপন্ন। সেই তিন মূল বর্ণ এই; নীল, পীত, লোহিত। এই তিন মূল বর্ণকে যত ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে মিশ্রিত করা যায়, তত ভিন্ন ভিন্ন উৎপন্ন বর্ণকে মিশ্র বর্ণ বলে। মিশ্র বর্ণের মধ্যে, হরিত, পাটল, ধূমল এই তিনটি প্রধান। নীল ও পীত, এই দুই মূল বর্ণ মিশ্রিত করিলে, হরিত বর্ণ উৎপন্ন হয়। পীত ও লোহিত, এই দুই মূল বর্ণ মিশ্রিত করিলে, পাটল বর্ণ হয়। নীল ও লোহিত, এই মূল বর্ণ মিশ্রিত করিলে, ধূমল বর্ণ হয়। তন্নিম্ন, কপিশ, ধূসর, পিঙ্গল ইত্যাদি নানা মিশ্র বর্ণ আছে। সে সকলও তিন মূল বর্ণের মিশ্রণে উৎপন্ন হয়।

শুরু ও কৃষ্ণ, সচরাচর বর্ণ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। কিন্তু শুরু ও কৃষ্ণ বর্ণ নহে। অমুক বস্তু শুরু, অমুক বস্তু কৃষ্ণ, ইহা বলিলে, সেই সেই বস্তুতে সর্ব বর্ণের অসন্ধ্যা, অর্থাৎ কোনও বর্ণ নাই, ইহাই প্রতীয়মান হইবেক। কার্গাস সূত্রে নির্ধৃত যৌত বস্ত্র শূরের উত্তম উদাহরণস্থল; রাত্রিকালীন প্রগাঢ় অন্ধকার কৃষ্ণের উত্তম দৃষ্টান্ত।

রামধনু ও ময়ূরপুচ্ছে এক কালে নানা বর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়। কখনও কখনও, গগনমণ্ডলে ধনুকের মত, নানা বর্ণের অতি সুন্দর যে বস্তু দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাকে লোকে রামধনু বলে। বৃষ্টিকালীন জলবিন্দুসমূহে সূর্যের কিরণ পড়িয়া, ঐরূপ নানা বর্ণের পরম সুন্দর ধনুকের আকার উৎপন্ন হয়। রামধনুতে, তিন মূল বর্ণ ও চারি মিশ্র বর্ণ,

সমুদয়ে সাত বর্ণ থাকে। ধনুকের উপরিভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া, যথাক্রমে লোহিত, পাটল, পীত, হরিত, নীল, ধূমল বায়লেট, এই সকল বর্ণ শোভা পায়। সূর্যের বিপরীত দিকে রামধনুর উদয় হইয়া থাকে।

বস্তুর আকার ও পরিমাণ

সকল বস্তুরই আকার ভিন্ন ভিন্ন। কোনও কোনও বস্তু বড়, কোনও কোনও বস্তু ছোট। ঘাটা অপেক্ষা কলসী বড়; বিভাল অপেক্ষা গরু বড়; শিশু অপেক্ষা যুবা বড়। সকল বস্তুরই আকার দৈর্ঘ্য, বিস্তার, বেধ এই তিন গুণ আছে। বস্তুর লম্বা দিকের পরিমাণকে দৈর্ঘ্য, দুই পৃষ্ঠের পরিমাণকে বেধ বলে। পুস্তকের উপরিভাগ হইতে নিম্নভাগ পর্যন্ত যে পরিমাণ, তাহার নাম দৈর্ঘ্য; এক পার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্ব পর্যন্ত যে পরিমাণ, তাহার নাম বিস্তার; এক পৃষ্ঠ হইতে অপর পৃষ্ঠ পর্যন্ত যে পরিমাণ, তাহার নাম বেধ।

বস্তুর দৈর্ঘ্য মাপা যাইতে পারে। আমরা কাপড়ের দৈর্ঘ্য মাপিতে পারি। এক স্থান হইতে আর এক স্থান কত দূর, তাহাও মাপা যায়। আমরা হস্ত দ্বারা সকল বস্তু মাপিয়া থাকি। কনুই অবধি মধ্যম অঙ্গুলির অগ্রভাগ পর্যন্ত এক হাত। সকলের হাত সমান নহে; এ নিমিত্ত, হাতের নিরূপিত পরিমাণ আছে। যথা, ৮ যবোদরে এক অঙ্গুল, ২৪ অঙ্গুলে ১ হাত। যবোদর শব্দে যবের মধ্যভাগ। আটটি যব সারি সারি রাখিলে, উহাদের মধ্যভাগের যে পরিমাণ, তাহাকে অঙ্গুল বলে। ঐরূপ ২৪ অঙ্গুলে, অর্থাৎ ১৯২ যবোদরে, এক হাত হয়। ৪ হাতে ১ ধনু; ২০০০ ধনুতে, অর্থাৎ ৮০০০ হাতে, ১ ক্রোশ হয়; ৪ ক্রোশে ১ যোজন।

লোকে বস্তুর দৈর্ঘ্য যেরূপে মাপে, বস্তুর উচ্চতাও সেইরূপে মাপা যায়। আমরা দেওয়াল, ঝুটি, কপাট, গাছ ইত্যাদির উচ্চতা মাপিতে পারি। বস্তুর উপরের দিকের যে দৈর্ঘ্য, তাহাকে উচ্চতা বলে। বস্তুর নিচের দিকের যে দৈর্ঘ্য তাহার নাম গভীরতা। দৈর্ঘ্য যেরূপে মাপা যায়, গভীরতাও সেই রূপে মাপা যাইতে পারে। কোনও কোনও কৃপের গভীরতা ১০, ১২ হাত; কোনও কোনও পুষ্করিণীর গভীরতা ২০, ২৫ হাত।

কোনও কোনও বস্তু, কোনও কোনও বস্তু অপেক্ষা অধিক ভারী। ক্ষুদ্র পুস্তক অপেক্ষা, বৃহৎ পুস্তক অধিক ভারী। সমান আকারের এক খণ্ড কাষ্ঠ অপেক্ষা, এক খণ্ড লৌহ অধিক ভারী। অনেক বস্তু ওজনে বিক্রীত হয়। বস্তুর ভারের পরিমাণকে ওজন কহে। সেই পরিমাণ এই—

১ টাকার যত ভার, তাহা ১ তোলা;

৫ তোলায় ১ ছটাক;

৪ ছটাকে ১ পোয়া;
৪ পোয়ায় ১ সের;
৪০ সেরে ১ মণ।

ধাতু

আমরা সর্বদা যে সকল বস্তু ব্যবহার করি, উহাদের অধিকাংশই ধাতু। খালা, ঘাটা, বাটা, গাডু, পিলসুজ, ছুরি, কাঁচি, চুঁচ ইত্যাদি বস্তু ও নানাবিধ অলঙ্কার, এ সমুদয় ধাতুনির্মিত।

অন্য অন্য বস্তু অপেক্ষা, ধাতুর ভার অধিক। অধিকাংশ ধাতু কঠিন, যা মারিলে সহসা ভাঙে না। ধাতু আপুনে গলান যায়। প্রায় সকল ধাতুকে পিটিয়া অতি পাতলা সরু তার প্রস্তুত করা যাইতে পারে। কোনও কোনও ধাতু এমন ভারসহ যে, সরু তারে ভারী বস্তু ঝুলাইলেও ছিড়িয়া পড়ে না।

ধাতু আকারে পাওয়া যায়। আকারে বিশুদ্ধ ও বিমিশ্র দুই প্রকার ধাতু থাকে। ধাতু যখন স্বভাবতঃ নির্দোষ হয়, তখন উহাকে বিশুদ্ধ বলা যায়; আর যখন অন্য অন্য বস্তুর সহিত মিশ্রিত থাকে, তখন উহাকে বিমিশ্র বলে। স্বর্ণ, রৌপ্য, পারদ, সীসা, তাম্র, লৌহ, রক্তা, দস্তা এই আটটি প্রধান ধাতু।

স্বর্ণ

গলাইলে স্বর্ণের ভার কমিয়া যায় না ও ব্যত্যয় হয় না; এজন্য স্বর্ণকে উৎকৃষ্ট ধাতু বলে। স্বর্ণ জল অপেক্ষা উনিশ গুণ ভারী। স্বর্ণ প্রমাণ স্বর্ণকে পিটিয়া দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে নয় অঙ্গুল পাত প্রস্তুত করা যাইতে পারে; এবং ঐ পরিমাণের স্বর্ণে ২৩৫ হাত তার প্রস্তুত হইতে পারে। স্বর্ণ এমন ভারসহ যে, এক যবোদরের মত স্থূল তারে ৫ মণ ৩৪ সের ওজন ঝুলাইলেও ছিড়িয়া পড়ে না।

স্বর্ণ স্বভাবতঃ অতিশয় উজ্জ্বল, দেখিতে অতি সুন্দর, মলিন হয় না; এজন্য লোকে উহাতে অলঙ্কার গড়ায়। স্বর্ণের মূল্য প্রায় সকল ধাতু অপেক্ষা অধিক। এ দেশে স্বর্ণে যে মুদ্রা প্রস্তুত হয়, তাহাকে মোহর বলে। ইংলণ্ডে সচরাচর যে স্বর্ণমুদ্রা ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহার নাম সডরিন; ইহাকেই এদেশের লোকে গিনি বলিয়া থাকে।

বিশুদ্ধ স্বর্ণের বর্ণ কাঁচা হরিদ্রার মত। বিশুদ্ধ স্বর্ণ অপেক্ষাকৃত নরম; এজন্য সচরাচর উহাতে ব্যবহারোপযোগী কোনও দ্রব্য প্রস্তুত হয় না। ব্যবহারোপযোগী করিতে হইলে, উহার সহিত অল্প তাম্র ও রূপা মিশ্রিত করিয়া দৃঢ় করিয়া লইতে হয়। এইরূপ তাম্র ও রূপা মিশ্রিত করাকে খাদ দেওয়া বলে।

পৃথিবীর প্রায় সকল প্রদেশেই স্বর্ণের আকর আছে; কিন্তু কলিফোর্নিয়া, অস্ট্রেলিয়া ও যুরোপ পর্বতেই অধিক।

রৌপ্য

রৌপ্য, জল অপেক্ষা প্রায় এগার গুণ ভারী। রৌপ্য শুষ্ক ও উজ্জ্বল। স্বর্ণে যে রূপ পাতলা পাত ও সরু তার হয়, ইহাতেও প্রায় সেইরূপ হইতে পারে। রৌপ্য এমন ভারসহ যে, এক যবোদরের মত স্থূল তার ৪ মণ ১১ সের ভার ঝুলাইলেও ছিড়িয়া পড়ে না।

পৃথিবীর প্রায় সকল প্রদেশেই রৌপ্যের আকর আছে; কিন্তু আমেরিকা দেশে সর্বাপেক্ষা অধিক।

রূপাতে টাকা, আধুলি, সিকি, দুয়ানি নির্মিত হয়। রূপাতে নানাবিধ অলঙ্কার গড়ায়, এবং ঘাটা বাটা প্রভৃতিও নির্মিত হইয়া থাকে।

পারদ

পারদ, রৌপ্যের ন্যায় শুষ্ক ও উজ্জ্বল। এই ধাতু জল অপেক্ষা প্রায় চৌদ্দগুণ ভারী। ইহা আর আর ধাতুর মত কঠিন নহে; জলের ন্যায় তরল; যাবতীয় তরল দ্রব্য অপেক্ষা অধিক ভারী; সর্বদা দ্রব অবস্থায় থাকে; কিন্তু মেরুসন্নিহিত দেশে লইয়া গেলে জমিয়া যায়। তখন অন্য ধাতুর ন্যায়, ইহাতেও সরু তার ও পাতলা পাত প্রস্তুত হইতে পারে; এবং ঘা মারিলে ইহা সহসা ভাঙিয়া যায় না।

স্পর্শ করিলে, পারদ স্বভাবতঃ সমস্ত তরল দ্রব্য অপেক্ষা শীতল বোধ হয়; কিন্তু অগ্নির উত্তাপ দিলে, সহজেই উষ্ণ হইয়া উঠে। পারদকে অনায়াসেই অসংখ্য খণ্ডে বিভক্ত করা যাইতে পারে। ঐ সকল খণ্ড গোলাকার হয়।

ভারতবর্ষ, চীন, তিব্বত, সিংহল, জাপান, সেন, অস্ট্রিয়া, বাভেরিয়া, পেরু, মেক্সিকো এই সকল দেশে পারদের আকর আছে।

সীস

সীস, স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি ধাতু অপেক্ষা নরম; জল অপেক্ষা এগার গুণ ভারী। সীসার ভার, রৌপ্য অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক। ইহা অল্প উত্তাপে গলে; অত্যন্ত অধিক উত্তাপ দিলে উড়িয়া যায়। জল বা অনাবৃত স্থানে ফেলিয়া রাখিলে, সীসের অধিক ভাবপরিবর্তন হয় না, উপরের উজ্জ্বলতা মাত্র নষ্ট হইয়া যায়।

ইংলণ্ড, স্কটল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড, জার্মানি, ফ্রান্স ও আমেরিকা, এই সকল দেশে অপরিমিত সীস পাওয়া যায়। হিমালয় পর্বতে ও তিব্বৎ দেশেও সীসের আকর আছে।

সীস কাগজের উপর টানিলে দূসর বর্ণের রেখা পড়ে। সীসেতে পেন্সিল প্রস্তুত হয়। অধিকাংশ সীসেতে গোলা ও গুলি নির্মিত হইয়া থাকে। কিছু শক্ত ও উত্তম রূপে গোলাকার করিবার নিমিত্ত, ইহাতে হরিতাল মিশ্রিত করে। রসাজন মিশ্রিত করিলে সীসেতে ছাপিবার অক্ষর নির্মিত হইয়া থাকে।

তাম্র

এই ধাতু জল অপেক্ষা আট গুণ ভারী। ইহা লালবর্ণ, উজ্জ্বল দেখিতে অতি সুন্দর। ইহাকে পিটিয়া যেমন পাত করা যায়, তার তেমন হয় না। তাম্র সকল ধাতু অপেক্ষা অতি গম্ভীরশব্দজনক; লৌহ অপেক্ষা অনেক সহজে গলান যায়। এক যবোদরের মত স্থূল তারে ৩ মণ ১৫ সের ভার ঝুলাইলেও, ছিড়িয়া যায় না।

তাম্রে পয়সা প্রস্তুত হয়। তামার পাত করিয়া জাহাজের তলা মুড়িয়া দেয়; তাহাতে জাহাজ শীঘ্র চলে ও শঙ্ক, শম্বক প্রভৃতি জাহাজের তলভেদ করিতে পারে না। অনেকে তামাতে পাকস্থালী, জলপাত্র প্রভৃতি প্রস্তুত করে।

তিন ভাগ দস্তা ও চারি ভাগ তামা মিশ্রিত করিলে, পিতল হয়। পিতল দেখিতে অতি সুন্দর; অনেক প্রয়োজনে লাগে। তামায় যত শীঘ্র মরিচা ধরে, পিতলে তত শীঘ্র ধরে না। পিতলে থালা, ঘটি, বাটী, কপসী ইত্যাদি নানা বস্তু প্রস্তুত করে।

সুইডন, সাক্সনি, গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স, পেরু, মেক্সিকো, চীন, জাপান, নেপাল, আঘা, আজমীর প্রভৃতি দেশে তাম্রের আকর আছে।

লৌহ

লৌহ, সকল ধাতু অপেক্ষা, অধিক কার্যোপযোগী। এই ধাতুতে লাজালের ফাল, কোদাল, কাম্টিয়া প্রভৃতি কৃষিকার্যের যন্ত্রসকল নির্মিত হয়। ছুরি, কাঁচি, কুড়াল, খস্তা, কাটারি, চাবি, কুলুপ, শিকল, পেরেক ইঁচ, হাতা, বেড়ি, কড়া, হাতুড়ি ইত্যাদি যে সকল বস্তু সর্বদা প্রয়োজনে লাগে, সে সমুদয় লৌহে নির্মিত হইয়া থাকে।

লৌহ, জল অপেক্ষা সাত আট গুণ ভারী। ইহা, রক্তাভিন্ন আর সকল ধাতু অপেক্ষা লঘু। লোহাতে মানুষের চুলের সমান সরু তার হইতে পারে। ইহা সকল ধাতু অপেক্ষা অধিক ভারসহ; এক যবোদরের মত স্থূল তারে ৬ মণ ১৭ সের ভারী বস্তু ঝুলাইলেও, ছিড়িয়া যায় না।

লৌহ, সকল ধাতু অপেক্ষা, অধিক পাওয়া যায়; এবং সকল দেশেই ইহার আকর আছে। কিন্তু ইংলন্ড, ফ্রান্স, সুইডন, রাশিয়া এই কয়দেশে অধিক।

রক্তা

রক্তা, অর্থাৎ রাস্তা, শুরুবর্ণ ও উজ্জ্বল; জল অপেক্ষা সাত গুণ ভারী; পূর্বোক্ত সকল ধাতু অপেক্ষা লঘু; রূপা অপেক্ষা নরম; সীস অপেক্ষা কঠিন।

ইংলন্ড, জার্মানি, চিলি, মেক্সিকো, বঙ্গদ্বীপ, এই কয় স্থানে সর্বাপেক্ষা অধিক রক্তা জন্মে।

এই ধাতুতে বান্ধ, পেটারি, কৌটা প্রভৃতি অনেক দ্রব্য নির্মিত হয়। দুই ভাগ রাস্তা ও সাত ভাগ তামা মিশ্রিত করিলে, উত্তম কাঁসা প্রস্তুত হয়।

ক্রয়-বিক্রয়-মুদ্রা

যাহাদের যে বস্তু অধিক থাকে, তাহারা সে বস্তু আপনাদের অবশ্যক মত রাখিয়া, অতিরিক্ত অংশ বেচিয়া ফেলে। আর, যাহাদের যে বস্তুর অপ্রতুল থাকে, তাহারা সেই বস্তু অন্য লোকের নিকট হইতে কিনিয়া লয়। লোকে মুদ্রা দিয়া আবশ্যক বস্তু কিনিয়া থাকে। যদি মুদ্রা চলিত না হইত, তাহা হইলে, নিজের কোনও বস্তুর সহিত বিনিময় করিয়া, অন্যের নিকট হইতে আবশ্যক বস্তু লইতে হইত। কিন্তু তাহাতে অনেক অসুবিধা ঘটিত।

কোনও বস্তু কিনিতে হইলে, যত মুদ্রা দিতে হয়, উহাকে ঐ বস্তুর মূল্য বলে। বস্তুর মূল্য সকল সময়ে সমান থাকে না; কখনও অধিক হয়, কখনও অল্প হয়। যখন যে বস্তু অধিক মূল্যে কিনিতে হয়, তখন তাহাকে মহার্ঘ ও অক্রেয় বলে। আর, যখন যে বস্তু অল্প মূল্যে কিনিতে পাওয়া যায়, তখন তাহাকে সুলভ ও সম্ভা বলে।

মুদ্রা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধাতুখণ্ড! স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, এই ত্রিবিধ ধাতুতে মুদ্রা নির্মিত হয়। এই সকল ধাতু দুষ্প্রাপ্য; এই নিমিত্ত, ইহাতে মুদ্রা প্রস্তুত করে। দেশের রাজা তিন্ণ আর কোনও ব্যক্তির মুদ্রা প্রস্তুত করিবার অধিকার নাই। রাজাও, স্বহস্তে মুদ্রা প্রস্তুত করেন না। মুদ্রা প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত, লোক নিযুক্ত করা থাকে। রাজা স্বর্ণ, রৌপ্য, ও তাম্রের যোগাড় করিয়া দেন; নিযুক্ত ভৃত্যেরা তাহাতে মুদ্রা প্রস্তুত করে। যে স্থানে মুদ্রা প্রস্তুত হয়, ঐ স্থানকে টাকশাল বলে। কলিকাতা রাজধানীতে একটি টাকশাল আছে।

টাকশালের লোকেরা হস্ত দ্বারা মুদ্রা প্রস্তুত করে না। মুদ্রা প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত, তথায় নানাবিধ কল আছে। টাকার উপর যে মুখ ও যে সকল অক্ষর মুদ্রিত থাকে, তাহা ঐ কলে প্রস্তুত হয়। ঐ মুখ ও ঐ অক্ষর, হস্ত দ্বারা নির্মিত হইলে, তত পরিশুদ্ধ হইত না। কোন রাজার অধিকারে, কোন বৎসরে, ঐ মুদ্রা প্রথম প্রস্তুত ও প্রচলিত হইল, এবং ঐ মুদ্রার মূল্য কত, ঐ সকল অক্ষরে ঐ সমুদয় লিখিত থাকে। আর, ঐ মুখও রাজার মুখের প্রতিকৃতি।

সকল দেশেই নানাবিধ মুদ্রা প্রচলিত আছে। আমাদের দেশে যে সকল মুদ্রা প্রচলিত, তন্মধ্যে পয়সা তাম্রনির্মিত; দুআনি, সিকি, আধুলি, টাকা রৌপ্য নির্মিত। আর, ঐরূপ সিকি, আধুলি, টাকা স্বর্ণ নির্মিতও আছে। স্বর্ণ নির্মিত টাকাকে সূবর্ণ ও মোহর বলে।

৪ পয়সায়

১ আনা;

৮ পয়সায়

১ দুআনি;

৪ আনায়

১ সিকি;

৮ আনা

১ আধূলি:

১৬ আনা

১ টাকা।

সিকি, পয়সা অপেক্ষা অনেক ছোট, কিন্তু এক সিকির মূল্য ১৬ পয়সা; ইহার কারণ এই যে, রৌপ্য তাম্র অপেক্ষা দৃশ্যাপ্য; এজন্য রৌপ্যের মূল্য তাম্র অপেক্ষা এত অধিক। স্বর্ণ সর্বাপেক্ষা দৃশ্যাপ্য; এজন্য স্বর্ণের মূল্য সর্বাপেক্ষা অধিক। ‘পূর্বে এক মোহরের মূল্য ১৬ টাকা অথবা ১০২৪ পয়সা ছিল; কিন্তু এক্ষণে উহার মূল্য তদপেক্ষা অনেক অধিক হইয়াছে। যদি রৌপ্য ও স্বর্ণের মুদ্রা এত দৃশ্যাপ্য না হইত, সকলে অনায়াসে পাইতে পারিত, তাহা হইলে মুদ্রার এত গৌরব হইত না। দৃশ্যাপ্য হওয়াতেই উহার এত মূল্য ও এত গৌরব হইয়াছে।

হীরক

যত প্রকার উৎকৃষ্ট প্রস্তর আছে, হীরকের জ্যোতি সর্বাপেক্ষা অধিক। হীরক আকরে জন্মে। পৃথিবীর সকল প্রদেশে হীরকের আকর নাই। ভারতবর্ষের দক্ষিণাত্য প্রদেশে গোলকুন্ডা প্রভৃতি কতিপয় স্থানে, দক্ষিণ আমেরিকার অন্তঃপাতী ব্রাজিল রাজ্যে, রুশিয়ার অন্তর্বর্তী ঘুরাল পর্বতে এবং আফ্রিকার দক্ষিণ বিভাগে হীরকের আকর আছে। আকর হইতে তুলিবার সময় হীরা অতিশয় মলিন থাকে, পরে পরিষ্কৃত করিয়া লয়।

এ পর্যন্ত যত বস্তু জানা গিয়াছে, হীরা সকল অপেক্ষা কঠিন। হীরার গুঁড়া বাতিরেকে আর কিছুতেই উহা পরিষ্কৃত করিতে পারা যায় না। বিশুদ্ধ হীরক অতি পরিষ্কৃত জলের ন্যায় নির্মল। এরূপ হীরাই অতি সুন্দর ও প্রশংসনীয়। তন্নিম্ন, রক্ত, পীত, নীল, হরিত প্রভৃতি নানা বর্ণের হীরা আছে। বর্ণ যত গাঢ় হয় হীরার মূল্য তত অধিক হয়। কিন্তু, বর্ণহীন নির্মল হীরা সকল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও মহামূল্য। আকার, বর্ণ, নির্মলতা অনুসারে, মূল্যের তারতম্য হয়।

হীরার মূল্য এত অধিক যে, শুনিলে বিশ্বাসাপন্ন হইতে হয়; পোর্চুগালের রাজার নিকট এক হীরা আছে, তাহার মূল্য ৫৬৪৪৮০০০ পাঁচ কোটি, চৌষট্টি লক্ষ, আটচল্লিশ সহস্র টাকা। আমাদের দেশে কোহিনুর নামে এক উৎকৃষ্ট হীরা ছিল। সচরাচর সকলে বলে, উহার মূল্য ৩৫০০০০০০ তিন কোটি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা। এক্ষণে, এই মহামূল্য হীরা ইংলণ্ডে আছে।

বিবেচনা করিয়া দেখিলে, হীরা অতি অকিঞ্চিৎকর পদার্থ। ঐচ্ছল্য ব্যতিরিক্ত উহার আর কোনও গুণ নাই; কাচ কাটা বই, আর কোনও বিশেষ প্রয়োজনে আইসে না। এরূপ প্রস্তরের এক খণ্ড গৃহে রাখিবার নিমিত্ত, এরূপ অর্থব্যয় করা কেবল মনের অহঙ্কার প্রদর্শন ও মূঢ়তাপ্রকাশ মাত্র।

ইহা অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয়, এই মহামূল্য প্রস্তর ও কয়লা, এক পদার্থ। কিছু দিন হইল, দেপ্রেও নামক এক ফরাসিদেশীয় পণ্ডিত, অনেক যত্ন, পরিশ্রম ও অনুসন্ধানের

পর, কয়লাতে হীরা প্রস্তুত করিয়াছেন। পূর্বে, কেহ কখনও ইহা গলাইতে পারে নাই; কিন্তু তিনি, বিদ্যার বলে ও বুদ্ধির কৌশলে, তাহাতেও কৃতকার্য হইয়াছেন।

হীরকের ন্যায়, নীলকান্ত, পদ্মরাগ, মরকত প্রভৃতি আরও বহুবিশ মহামূল্য প্রস্তর আছে। শোভা ও মূল্য বিষয়ে, উহার হীরক অপেক্ষা অনেক নূন। হীরক, নীলকান্ত, পদ্মরাগ মরকত প্রভৃতি মহামূল্য প্রস্তর সকলকে মণি ও রত্ন বলে।

কাচ

কাচ অতি কঠিন, নির্মল, মসৃণ পদার্থ, এবং অতিশয় ভঙ্গ্যপ্রবণ, অর্থাৎ অনায়াসে ভাঙিয়া যায়। কাচ স্বচ্ছ, এ নিমিত্ত, উহার ভিতর দিয়া, দেখিতে পাওয়া যায়। ঘরের মধ্যে থাকিয়া, জানালা ও কপাট বন্ধ করিলে, অন্ধকার হয়, বাহিরের কোনও বস্তু দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু সারি বন্ধ করিলে, পূর্বের মত আলোকে থাকে, ও বাহিরের বস্তু দেখা যায়। তাহার কারণ এই, সারি কাচে নির্মিত; সূর্যের আভা, কাচের ভিতর দিয়া আসিতে পারে, কিন্তু কাচের ভিতর, আসিতে পারে না।

বালুকা ও এক প্রকার ক্ষার, এই দুই বস্তু একত্রিত করিয়া, অগ্নির উৎকৃষ্ট উত্তাপ লাগাইলে, গলিয়া উভয়ে মিলিয়া যায়, এবং নীতল হইলে কাচ হয়। বালুকা যেরূপ পরিষ্কার থাকে, কাচ সেই অনুসারে পরিষ্কার হয়। কাচে লাল, সবুজ, হরিদ্রা প্রভৃতি রঙ করে; রঙ করিলে, অতি সুন্দর দেখায়।

কাচ অনেক প্রয়োজনে লাগে। সারি, আরসি, সিসি, বোতল, গেলাস, বাদ, নর্টন, ইত্যাদি নানা বস্তু কাচে প্রস্তুত হয়।

কাচ কোনও অস্ত্রে কাটা যায় না, কেবল হীরাতে কাটে। হীরার সূক্ষ্ম অগ্রভাগ কাচের উপর দিয়া টানিয়া গেলে, একটি দাগ পড়ে। তার পর জোর দিলেই দাগে দাগে ভাঙিয়া যায়। যদি হীরার অগ্রভাগ স্বভাবতঃ সূক্ষ্ম থাকে, তবেই তাহাতে কাচ কাটা যায়; যদি হীরা ভাঙিয়া অথবা আর কোনও প্রকারে উহার অগ্রভাগ সূক্ষ্ম করিয়া লওয়া যায়; তাহাতে কাচের গায়ে আঁচড় মাত্র লাগে, কাটিবার মত দাগ বসে না।

কাচ প্রস্তুত করিবার প্রণালী প্রথমে কি প্রকারে প্রকাশিত হয়, তাহা নির্ণয় করা অসাধ্য। এরূপ জনশ্রুতি আছে, ফিনিসিয়া দেশীয় কতকগুলি বণিক জনপথে বাণিজ্য করিতে যাইতেছিলেন। সিরিয়া দেশে উপস্থিত হইলে বড় ভ্রমানে তাঁহাদিগকে সমুদ্রের তীরে লইয়া ফেলে। বণিকেরা, তীরে উঠিয়া, বালির উপর পাক করিতে আরম্ভ করেন। সমুদ্রের তীরে কেলী নামে এক প্রকার চারা গাছ ছিল; উহার কাষ্ঠে তাঁহারা আগুন জ্বালিয়াছিলেন। বালি ও কেলির ক্ষার মিশ্রিত হইয়া অগ্নির উত্তাপে গলিয়া, কাচ হইয়াছিল; উহা দেখিয়া, এ বণিকেরা কাচ প্রস্তুত করিতে শিখিয়াছিলেন।

যে রূপে, যে দেশে, কাচের প্রথম উৎপত্তি হটক, উহা বহুকাল অবধি প্রচলিত আছে, তাহার সন্দেহ নাই। প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে কাচের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। মিসর দেশেও, বহু বৎসর পূর্বে, কাচের ব্যবহার ছিল, তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

জল-নদী-সমুদ্র

জল অতি তরল বস্তু, স্রোত বহিয়া যায়, এবং এক পাত্র হইতে আর এক পাত্রে ঢালিতে পারা যায়। পৃথিবীর অধিকাংশ জলে মগ্ন। যে জলরাশি পৃথিবীকে বেষ্টিত করিয়া আছে, তাহার নাম সমুদ্র।

সমুদ্রের জল এত লোণা ও এমন বিষাদ যে, কেহ পান করিতে পারে না। সমুদ্রের জল সকল স্থানে সমান লোণা নহে; কোনও স্থানে অল্প লোণা, কোনও স্থানে অধিক। সমুদ্রের উপরিভাগের জল বৃষ্টি ও নদীর জলের সঙ্গে মিশ্রিত হয়; এজন্য, ভিতরের জল যত লোণা, উপরের জল তত নয়। উত্তর সমুদ্র অপেক্ষা দক্ষিণ সমুদ্রের জল অধিক লোণা।

অল্প পরিমাণে সমুদ্রের জল লইয়া পরীক্ষা করিলে, দেখিতে পাওয়া যায়, উহাতে কোনও বর্ণ নাই। কিন্তু সমুদ্রের রাশীকৃত জল নীলবর্ণ দেখায়। নীলবর্ণ দেখায় কেন, তাহার কারণ এ পর্যন্ত স্থিরকৃত হয় নাই।

সমুদ্র কত গভীর এ পর্যন্ত তাহার নির্ণয় হয় না। কেহ কেহ অনুমান করেন, যেখানে সর্বাপেক্ষা অধিক গভীর সেখানেও আড়াই ক্রোশের বড় অধিক হইবেক না। অনেকে সমুদ্রের জল মাশিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কেহ ৩১২০ হাত কেহ ৪৮০০ হাত কেহ ১৮৪০০ হাত দীর্ঘমানরজ্জু সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত করিয়াছিলেন; কিন্তু কোনও রজ্জুই তলস্পর্শ করিতে পারে নাই; সুতরাং সমুদ্রের জলের ইয়ত্তা করা দুঃসাধ্য। লাপাস নামক ফরাসিদেশীয় অতি প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বলিয়াছেন এক্ষণে সমুদ্রে যত জল আছে, যদি আর তাহার চতুর্থ ভাগ অধিক হয়, তবে সমস্ত পৃথিবী জলপ্রাকৃত হইয়া যায়; আর যদি তাহার চতুর্থ ভাগ ন্যূন হয়, তাহা হইলে, সমুদ্র নদী, খাল প্রভৃতি শুকাইয়া যায়।

যথানিয়মে প্রতিদিন সমুদ্রের জলের যে হ্রাস ও বৃদ্ধি হয়, উহাকে জুয়ার ও ভাটা বলে। অর্থাৎ, সমুদ্রের জল যে সহসা স্খ্যিত হইয়া উঠে তাহাকে জুয়ার বলে; আর, ঐ জল পুনরায় যে ক্রমে ক্রমে অল্প হইতে থাকে, তাহাকে ভাটা বলে। সূর্য ও চন্দ্রের আকর্ষণে এই অদ্ভুত ঘটনা হয়।

লোকে জাহাজে চড়িয়া, সমুদ্রের উপর দিয়া, এক দেশ হইতে অন্য দেশে যায়। যদি জাহাজে ঝড় ও তুফানে পড়ে, অথবা পাহাড়ে কিংবা চড়ায় লাগে, তাহা হইলে বড় বিপদ। জাহাজের সমস্ত লোকের প্রাণ নষ্ট হইতে পারে।

সমুদ্র এত বিস্তৃত যে, কতক দূর গেলে, আর তীর দেখা যায় না, অথচ জাহাজের লোক পথহারা হয় না। তাহার কারণ এই, জাহাজে কম্পাস নামে একটি যন্ত্র থাকে; ঐ

যন্ত্রে একটি সূচী আছে, জাহাজ যে মুখে বাড়িক না কেন, সেই সূচী সর্বদা উত্তর মুখে থাকে; তাহা দেখিয়া, নাবিকেরা দিক নির্ণয় করে।

প্রাতঃকালে যে দিকে সূর্যের উদয় হয়, উহাকে পূর্ব দিক বলে; যে দিকে সূর্য অস্ত যায়, তাহাকে পশ্চিম দিক বলে। পূর্ব দিকে ডান হাত করিয়া দাঁড়াইলে, সম্মুখে উত্তর ও পশ্চাতে দক্ষিণ দিক হয়। এই পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ লক্ষ্য করিয়া লোকে কি স্থলপথে কি জলপথে পৃথিবীর সকল স্থানে যাতায়াত করে।

নদীর জল ও অন্য অন্য স্রোতের জল সুস্বাদ, সমুদ্রের জলের ন্যায় বিষাদ ও লবণময় নহে। যাবতীয় নদীর উৎপত্তি স্থান প্রসবণ। গঙ্গা, সিন্ধু, ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি যত বড় নদী আছে, সকলেরই এক এক প্রসবণ হইতে উৎপত্তি হইয়াছে। বর্ষাকালে সর্বদা বৃষ্টি হয়; এজন্য ঐ সময়ে সকল নদীর প্রবাহের বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

সমস্ত প্রধান নদীর জল সমুদ্রে পড়ে। কিন্তু তাহাতে সমুদ্রে জলের বৃদ্ধি হয় না। কারণ, নদীপাত দ্বারা সমুদ্রের যত জল বাড়ে, ঐ পরিমাণে সমুদ্রের জল সর্বদা কুণ্ডলটিকা ও বাষ্প হইয়া আকাশে উঠে। ঐ সমস্ত বাষ্প মেঘ হয়। পুনরায়, নদীর প্রবাহের বৃদ্ধি হয়।

সমুদ্র ও নদীতে নানা প্রকার মৎস্য ও জলজন্তু আছে।

উদ্ভিদ

যে সকল বস্তু ভূমিতে জন্মে, উহাদিগকে উদ্ভিদ বলে; যেমন তৃণ, লতা, বৃক্ষ ইত্যাদি। উদ্ভিদসকল যখন বাড়িতে থাকে, তখন উহাদিগকে জীবিত বলা যায়; আর, যখন শুকাইয়া যায় আর বাড়ে না, তখন উহাদিগকে মৃত বলে। উদ্ভিদের জীবন আছে বটে, কিন্তু, জন্তুগণের ন্যায়, এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতে পারে না। উহারা যেখানে জন্মে, সেইখানে থাকে; এ নিমিত্ত, উহাদিগকে স্থাবর বলে।

উদ্ভিদ সকল, মূল দ্বারা ভূমি হইতে রসের আকর্ষণ করে। ঐ আকৃষ্ট রস মূল হইতে স্ফন্দনদেহে উঠে; তৎপরে, ক্রমে ক্রমে সমস্ত শাখা, প্রশাখা ও পত্র প্রবেশ করে। এই রূপে, ভূমির রস উদ্ভিদের সর্ব অবয়বে সঞ্চারিত হয়; তাহাতে উহারা জীবিত থাকে ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। উদ্ভিদ যদি সূর্যের উষ্ণতা না পায়, তাহা হইলে বাড়িতে পারে না। শীতকালে রসের সঞ্চার রুদ্ধ হয়; এজন্য পত্র সকল শূষ্ক ও পতিত হয়। বসন্তকাল উপস্থিত হইলে, পুনর্বীর রসের সঞ্চার হইতে আরম্ভ হয়; তখন নূতন পত্র নির্গত হইতে থাকে।

বৃক্ষ লতা উদ্ভিদগণের অবয়বসকল ছালে আচ্ছাদিত। অবয়বসকল ছালে আচ্ছাদিত বলিয়া, উদ্ভিদে আঘাত লাগে না, এবং পুষ্টি বিষয়েও অনুকূল্য হয়। যদি ছাল অত্যন্ত আঘাত পায়, তাহা হইলে উদ্ভিদ নিস্তেজ হইয়া পড়ে, এবং ক্রমে শুকাইয়া যায়।

প্রায় সমস্ত উদ্ভিদের ফলের মধ্যে বীজ জন্মে। সেই বীজ ভূমিতে রোপিলে, তাহা হইতে নূতন উদ্ভিদের উদ্ভব হয়। কতকগুলি উদ্ভিদ এরূপ আছে যে, উহাদের শাখা অথবা মূলের কিয়দংশ ভূমিতে রোপিয়া দিলে, নূতন উদ্ভিদ জন্মে।

উদ্ভিদ, মানুষের জীবনধারণের প্রধান উপায়। আমরা কি অনু, কি বস্ত্র, কি বাসগৃহ, সমুদয়ই উদ্ভিদ হইতে লাভ করি। ফল, মূল, পত্র, পুষ্প প্রভৃতি আমাদের আহার; কাষ্ঠাদি দ্বারা অগ্নি জ্বলিয়া অনু বাজান প্রভৃতি রক্ষণ করি; তুলা হইতে সূত্র প্রস্তুত করিয়া লই; এবং তুণ, কাষ্ঠ প্রভৃতি দ্বারা বাসগৃহ নির্মাণ করিয়া থাকি।

ভক্ষুর ন্যায় উদ্ভিদের আয়তন এবং আকারের বৈলক্ষণ্য ভারতবর্ষে আছে। আফ্রিকাদেশস্থ বাওবাব বৃক্ষের কাণ্ড এরূপ স্থূল যে, তাহার বহুল খুলিয়া লইয়া তাঁহু প্রস্তুত করিলে তন্মধ্যে চল্লিশ পঞ্চাশ ব্যক্তি অবলীলাক্রমে শয়ন করিতে পারে। অস্ট্রেলিয়া দ্বীপে দেবদারু জাতীয় একপ্রকার বৃক্ষ, তিন শত হস্তেরও অধিক উচ্চ হইয়া থাকে। ভূমি হইতে ত্রিশ পঁয়ত্রিশ হাত পর্যন্ত তাহার কোনও শাখা প্রশাখা থাকে না; অতএব তাহার গুড়িই ত্রিতল অপেক্ষা উচ্চ। আমাদের দেশেও শাল বট প্রভৃতি নানাবিধ প্রকাণ্ড বৃক্ষ আছে। বটবৃক্ষ তদুচ্চ না হইলেও আয়তনে অতি বৃহৎ হইয়া থাকে। গুজরাট প্রদেশে একটি বটবৃক্ষ ছিল; তিন চারি সহস্র লোক তাহার ছায়ায় বিশ্রাম করিতে পারিত।

একদিকে যেদূর বৃহৎকার বৃক্ষ আছে, অপর দিকে সেইদূর ক্ষুদ্রাকৃতি উদ্ভিদও দেখিতে পাওয়া যায়। ছত্রাক বা কোড়ক জাতীয় কোনও কোনও উদ্ভিদ এত ক্ষুদ্র যে, অপূর্বীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে ব্যতিরেকে দৃষ্টিগোচর হয় না। বর্ষাকালে পুস্তকে যে ছাতা পড়ে, তাহা এই জাতীয় উদ্ভিদ। কোনও কোনও কোড়ক অপেক্ষাকৃত বৃহৎ হয়; উহাদিগকে বেঙের ছাতা বলে।

আম, কাঁঠাল, জাম, আতা, পিয়াজা, বাদাম, দাড়িম ইত্যাদি নানাবিধ মিষ্ট ও সুস্বাদু ফল বৃক্ষে জন্মে। যেখানে এই সকল ফলের বৃক্ষ অনেক থাকে, তাহাকে উদ্যান বলে। যেখানে ধনু পুষ্পবৃক্ষ রোপণ করা যায়, তাহাকে পুষ্পোদ্যান কহে।

কতকগুলি বৃক্ষের ছালে আমাদের অনেক উপকার হয়। স্পেন দেশে কর্ক নামে এক প্রকার বৃক্ষ জন্মে। উহার বহুল এরূপ স্থূল, কোমল ও রশ্মিশূন্য যে তদ্বারা শিশি, বোতল প্রভৃতির ছিপি নির্মিত হয়। আমেরিকায় পেরু প্রদেশস্থ সিল্ভেরানা নামক বৃক্ষের ত্বক নিম্ব করিলে যে কাথ হয়, তাহা হইতে কুইনাইন উৎপন্ন হয়। ইস্তানীং দার্জিলিং অঞ্চলে সিল্ভেরানার চাষ হইতেছে। পাট ও শণ গাছের ছালের তন্তু হইতে চট, রজ্জু প্রভৃতি প্রস্তুত হয়; তিসির ছাল হইতে যে সূক্ষ্ম তন্তু বাহির হয়, তাহাতে মিনেন, কেম্বুক ইত্যাদি উৎকৃষ্ট বস্ত্রের বয়ন হইয়া থাকে।

অসুখের সময়, রোগীকে যে এরোবুট পথ্য দেওয়া হয়, তাহা হরিদ্রজাতীয় এক প্রকার বৃক্ষের মূল হইতে উৎপন্ন হয়। কোনও কোনও বৃক্ষের মূল দেশে কচুর ন্যায় এক

প্রকার পদার্থ জন্মে, ঐ পদার্থকে কন্দ বলে; যেমন আলু, পলাশু, ওল, মানকচু শালগম ইত্যাদি।

অনেকে প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যায়ে, চা খাইয়া থাকেন। ঐ চা এক প্রকার গুল্মের শুষ্ক পত্র কিয়ৎক্ষণ উষ্ণ জলে রাখিয়া দিলে, প্রস্তুত হয়। চীন, জাপান, আসাম, দার্জিলিং প্রভৃতি দেশে প্রচুর পরিমাণে, ঐ গুল্মের চাষ হইয়া থাকে। বঙ্গদেশে অনেক স্থানে নীলের চাষ হয়। উহার গাছ জলে পচাইলে, এক প্রকার নীলবর্ণ পদার্থ বাহির হয়; ঐ পদার্থ পৃথক করিয়া লইয়া শুষ্ক করিলেই, নীলবড়ি উৎপন্ন হইয়া থাকে।

কোনও কোনও বৃক্ষের নির্বাস বা আঠা অনেক প্রয়োজনে লাগে। কাগজ হইতে পেন্সিল বা কালির দাগ উঠাইবার জন্য যে রবার ব্যবহৃত হয়, তাহা বটগাছের ন্যায় একপ্রকার বৃহৎ গাছের আঠা মাত্র। ধূনা, তাম্বিন তৈল, খদির, হিজল, কর্পূর, গঁদ ইত্যাদি সমুদয়ই বৃক্ষনির্বাস হইতে উৎপন্ন। পোস্ত গাছের ফল চিরিয়া দিলে যে রস নির্গত হয়, তাহা হইতে অহিফেন বা আফিম প্রস্তুত হয়।

সুমাত্রা, বোর্নিও প্রভৃতি দ্বীপে তালজাতীয় এক প্রকার বৃক্ষ জন্মে, উহার মজ্জা হইতে সাগুদানা প্রস্তুত হইয়া থাকে।

পরিশ্রম-অধিকার

আমরা চারিদিকে যে সমস্ত বস্তু দেখিতে পাই ঐ সকল বস্তু কোনও না কোনও লোকের হইবে। যে বস্তু যাহার, সে ব্যক্তি পরিশ্রম করিয়া উহা প্রাপ্ত হইয়াছে। বিনা পরিশ্রমে কেহ কোন বস্তু পাইতে পারে না, ভিক্ষা করিলে, পরিশ্রম ব্যতিরেকে, কোনও কোনও বস্তু পাওয়া যাইতে পারে; কিন্তু ভিক্ষা করা ভদ্রলোকের কর্ম নয়। যে ভিক্ষা করে, সে নিতান্ত নিম্নস্তর ও নীচাশয় এবং সকল লোকের ঘৃণা ও অশ্রদ্ধার ভাজন হয়।

যদি কোনও ব্যক্তি কখনও পরিশ্রম না করিত, তাহা হইলে গৃহনির্মাণ কৃষিকর্ম সম্পন্ন হইত না, খাদ্যসামগ্রী, পরিধেয় বস্ত্র ও পাঠ্য-পুস্তক, কিছুই পাওয়া যাইত না, সকল লোকে দূরখে কল্যাণপন করিত; পৃথিবী এন্ধরণে, অপেক্ষাকৃত যেরূপ সুখের স্থান হইয়াছে, সেদূর কদাচ হইত না।

পরিশ্রম না করিলে কেহ কখনও ধনবান হইতে পারে না। কেহ কেহ পৈতৃক বিষয় পাইয়া ধনবান হয়, বতর্থাৎ বটে; কিন্তু তাহার পরিশ্রম না করুক, তাহাদের পূর্বপুরুষেরা, অর্থাৎ পিতা, পিতামহ প্রভৃতি পরিশ্রম দ্বারা ঐ ধন উপার্জন করিয়া গিয়াছেন। বিনা পরিশ্রমে এরূপ ধনভান্ড অল্প লোকের ঘাটে; সুতরাং সেই কয়জন তিন, সকল লোককেই পরিশ্রম করিতে হয়।

যেহে পরিশ্রম করিয়া অর্থ উপার্জন করে। অর্থ না হইলে সংসারযাত্রা সম্পন্ন হয় না। অনু, বস্ত্র, গৃহ প্রভৃতি সমস্ত বস্তু অর্থসাধ্য। যদি অতঃপর আর কেহ পরিশ্রম না

করে, তবে যে সকল আহার্যসামগ্রী প্রস্তুত আছে, অল্পকালের মধ্যে তাহা ফুরাইয়া যাইবে; সমস্ত বস্ত্র, ক্রমে ক্রমে ছিন্ন হইবে এবং আর যে সকল বস্তু আছে, সমস্তই কালক্রমে শেষ হইবে। তাহা হইলে সকল লোককে নানা কষ্ট পাইয়া প্রাণত্যাগ করিতে হইবে।

বালকেরা পরিশ্রম করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতে সমর্থ নহে। তাহারা যতদিন কর্মক্ষম না হয়, পিতা মাতা তাহাদের প্রতিপালন করেন। অতএব, যখন পিতা মাতা বৃদ্ধ হইয়া কর্ম করিতে অক্ষম হন, তখন তাহাদের প্রতিপালন করা পুত্রদিগের অবশ্য কর্তব্য কর্ম; না করিলে ঘোরতর অধর্ম হয়।

বালকগণের উচিত, বাধ্যকাল অবধি পরিশ্রম করিতে অভ্যাস করা; তাহা হইলে বড় হইয়া অনায়াসে সকল কর্ম করিতে পারিবে। স্বয়ং অনু-বস্ত্রের ক্রেশ পাইবে না এবং বৃদ্ধ পিতা মাতার প্রতিপালন করিতেও পারগ হইবে। কোনও কোনও বালক এমন হতভাগ্য যে, সর্বদা অলস হইয়া সময় নষ্ট করিতে ভালবাসে; পরিশ্রম করিতে হইলে সর্বনাশ উপস্থিত হয়। তাহারা বাল্যকালে বিদ্যাভ্যাসে, এবং বড় হইয়া ধনোপার্জন কিছুই করিতে পারে না, সুতরাং যাবজ্জীবন ক্রেশ পায়, এবং চিরকাল পরের গলগ্রহ হইয়া থাকে।

যে ব্যক্তি পরিশ্রম করিয়া যে বস্তু উপার্জন করে, অথবা অন্যের দত্ত যে বস্তু প্রাপ্ত হয়, সে বস্তু তাহারই থাকা উচিত। লোকে জানে, আমি পরিশ্রম করিয়া যে বস্তু উপার্জন করিব, তাহা আমারই থাকিবে, অন্যে লইতে পারিবে না; এজন্যই তাহার পরিশ্রম করিতে প্রবৃত্তি হয়। কিন্তু সে যদি জানিত, আমার পরিশ্রমের ধন অন্যে লইবে, তাহা হইলে তাহার কখনও পরিশ্রম করিতে প্রবৃত্তি হইত না।

যদি কেহ অন্যের বস্তু লইতে বাঞ্ছা করে, ঐ বস্তু তাহার নিকট চাহিয়া অথবা কিনিয়া লওয়া উচিত; অজ্ঞাতসারে অথবা বলপূর্বক, কিংবা প্রতারণা করিয়া লওয়া উচিত নহে। এরূপ করিয়া লইলে, অপহরণ করা হয়।

যদি কাহারও কোন দ্রব্য হারায়, তাহা পাইলে ততক্ষণ তাহাকে দেওয়া উচিত; আপনার হইল মনে করিয়া লুকাইয়া রাখিলে চুরি করা হয়। চুরি করা বড় দোষ। দেখ, ধরা পড়িলে চোরকে কত নিগ্রহভোগ করিতে হয়; তাহার কত অপমান; সে সকলের ঘৃণাস্পদ হয়; চোর বলিয়া কেহ বিশ্বাস করে না; কেহ তাহার সহিত আলাপ করিতে চাহে না। অতএব, প্রমাণান্তেও পরের দ্রব্যে হস্তাপর্গ করা উচিত নহে।

কতকগুলি সাধারণ বস্তু আছে; তাহাতে সকল লোকের সমান অধিকার; সকলেই বিনা পরিশ্রমে পাইতে পারে। বায়ু সূর্যের আলোক, বৃষ্টি ও নদীর জল এ সমস্ত ও এরূপ আর আর বস্তুতে সকল লোকেরই সমান অধিকার। এতদ্বিন্ন আর কোনও বস্তু পাইবার বাঞ্ছা করিলে, অবশ্য পরিশ্রম করিতে হইবে; বিনা পরিশ্রমে তাহা পাইবার কোনও সম্ভাবনা নাই।

দুই শব্দের অর্থ

অণুবীক্ষণ-চক্ষুর অগোচর অতি ক্ষুদ্র বস্তু সকল যে যন্ত্র দ্বারা দেখিতে পাওয়া যায়।
অভিজ্ঞতা-অনেক দেখিয়া শুনিয়া যে জ্ঞান জন্মে।

অগ্নীল-কুৎসিত, ঘৃণাকর, লজ্জাজনক।

কপিশ-মেটিয়া।

কলাই-কোনও ধাতু গলাইয়া অন্য কোনও ধাতুনির্মিত প্রভৃতিতে মাখাইয়া দেওয়া।

সাধারণতঃ রক্ত ও দস্তা গলাইয়া কলাই করা হইয়া থাকে।

ধূমল-বেগুনিয়া।

ধূসর-পীপাটিয়া।

নীলকান্ত-নীলবর্ণের মণি।

পটহ-ঢাক।

পাটল-পাটকিলে।

পদ্মগগন-লোহিতবর্ণের মণি।

পিঙ্গাল-পীতের অভাযুক্ত গাঢ় নীল।

প্রস্রবণ-নির্ঝর, ঝরণা, পর্বতের উপরিভাগ হইতে যে জল নিম্নে পতিত হয়।

মরকত-হরিতবর্ণের মণি।

মসৃণ-যাহার উপরিভাগ এমন সমান যে, স্পর্শ করিলে কোনও মতে উচ্চনীচ বোধ হয় না।

মস্তিষ্ক-মস্তকের ভিতর ঘূতের মত যে কোমল বস্তু থাকে; ইদানীন্তন যুরোপীয় পণ্ডিতেরা মস্তিষ্ককে মন ও বুদ্ধির স্থান বলেন।

মেরু-পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্তদ্বয়। এই দুই স্থান অত্যন্ত হিমপ্রধান। এজনা ভায়ে দুব্য জমিয়া যায়।

লোহিত-লাল।

ভায়লেট-ঈষৎ লালের অভাযুক্ত গাঢ় নীল।

বিনিময়-বদল।

বিনিয়োগ-প্রয়োগ, কোনও বিষয়ে নিয়োজিতকরণ।

সাল ও হিজিরা-হিজিরার ৯৬৩ অব্দে সম্রাট আকবর ঐ শাককে ইলাহী নামে প্রবর্তিত করেন। হিজিরার বৎসর চান্দ্রমাস অনুসারে পরিগণিত, ইলাহীর বৎসর সৌরমাস অনুসারে পরিগণিত। চান্দ্রমাস অনুসারে পরিগণিত বৎসর ৩৪৫ দিন, ২১ দণ্ড, ৩৫ পল, আর সৌরমাস অনুসারে পরিগণিত বৎসর ৩৬৫ দিন, ১৫ দণ্ড, ৩২ পল হয়। ইলাহী

প্রবর্তনের সময় হইতে চান্দ্রমাসের অনুযায়ী গণনা অনুসারে ৩৫৫ বৎসর; আর
সৌরমাসের অনুসারে ৩৪৫ বৎসর হইয়াছে। সুতরাং এক্ষণে ইজিরার অংক ১৩৩১;
ইলাহীর অংক ১৩১৯। সাল ইলাহীর নামান্তর মাত্র।

জ্ঞানু-সর্ব শরীরে সম্ব্যাপিত সূত্রবৎ পদার্থসমূহ। মস্তিষ্কের সহিত এই সকল
পদার্থের যোগ আছে। এইজন্য কোন বস্তু ইন্দ্রিয়গোচর হইলে তদ্বিময়ক জ্ঞান জানে।

হরিত-সবুজ।

হোরা-ইংরেজী এক ঘণ্টা, অড়াই দশ কাল।

banglainternet.com